

মেডিটেশন চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপূরক

মেডিসিনের একটি
আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা আছে।
তাহলে, medicine is a
substance which
consoles always,
relieves often and
cures seldom. অর্থাৎ
ঔষুধ এমন একটা বস্তু যা



সান্ত্বনা দেয় সবাইকে, স্বস্তি দেয় অধিকাংশকে, কিন্তু
নিরাময় করে কতিপয় মানুষকে। কাজেই ঔষুধ দিয়ে
কিছু লোককে রোগমুক্ত করা যায়, কিন্তু ঔষুধে সব
লোক ভালো হয়ে যাবে, এমন কথা আমরা মেডিসিন
বিশেষজ্ঞরাও বলি না। যেমন : আমাদের কাছে যদি
দশজন মানুষ মাথাব্যথা নিয়ে আসেন, আমরা চিহ্নিত
করি কেন এই মাথাব্যথা হচ্ছে। কারও হয়তো
চোখের সমস্যার জন্যে, কারও কানে ইনফেকশনের
জন্মে বা কারও টেনশন, উৎকর্ষার কারণে বা কারও
ব্রেন টিউমারের জন্যে। কিন্তু ব্যথার তীব্রতা হয়তো
সবারই এক। এখন, কারও যদি ব্রেন টিউমারের
কারণে মাথাব্যথা হয়, তাকে তো অপারেশন করতে
হবে। নইলে তার মাথাব্যথা সারবে না।

কিন্তু যিনি টেনশন, উদ্বেগ, দৃষ্টিভঙ্গি এসব কারণে
মাথাব্যথায় ভুগছেন, তাকে তো শুধু ঔষুধ দিয়ে
ভালো করা যাবে না। তাকে আগে টেনশন মুক্ত
করতে হবে, সেটা ঔষুধে সম্ভব নয়।

শুধু মাথাব্যথাই নয়, করোনারী আর্টারী ব্লক বা
হাট অ্যাটাকের প্রধান কারণও মানসিক উদ্বেগ।

তাই আমরা বলি এই টেনশনকে দূর করতে
প্রশান্তির জন্যে যদি কোনো কোর্স থাকে, তবে তা
আমাদের মেডিক্যাল সাইন্সে স্বীকৃত।

আবার মানসিক রোগের কথা ধরুন। সেক্ষেত্রে
কিছু ঔষুধ দেয়া হয়। হয়তো কাজও হয়। কিন্তু
মানসিক চিকিৎসার একটা বড় বিষয় হলো সাইকো
থেরাপি। যাতে আসলে রোগীকে তার দুঃখের কথা,
কষ্টের কথা, উদ্বেগের কথা বলতে দেয়া হয়। তার
যখন সব বলা হয়ে যায়, তখন হয়তো ডাক্তার কিছু
কথা বলেন। যেমন, আপনি যে বলছেন, পারবেন
না, এটা ঠিক নয়, এভাবে করুন, নিশ্চয়ই পারবেন।
অর্থাৎ ইতিবাচক চিন্তা এবং আশাবাদ ব্যক্ত করা।
মেডিটেশন কোর্সেও আসলে সেই প্রক্রিয়াটিই
ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে মানুষ উজ্জীবিত হচ্ছে এবং
তার সমস্যার সমাধান হচ্ছে।

তাই আমি অত্যন্ত আনন্দ চিন্তে একথা বলছি
যে, কোয়ান্টাম মেডিটেশন পুরোপুরি বিজ্ঞান ভিত্তিক
এবং এটি মেডিক্যাল সাইন্সের পরিপূরক হিসেবে
সফলভাবেই তার ভূমিকা রাখছে।

[সাবেক আইপিজিএমআর-এর পরিচালক ও বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস
চ্যান্সেলর প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ তাহির বর্তমানে
মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান। তিনি ১৩২ ব্যাচে
বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে ৪০ ঘণ্টা ক্লাসে অংশগ্রহণের
পর প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে সুদীর্ঘ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।]

অক্টোবর ২০০১

কোয়ান্টাম বুলেটিন



রাজশাহীর গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে গুরুজী

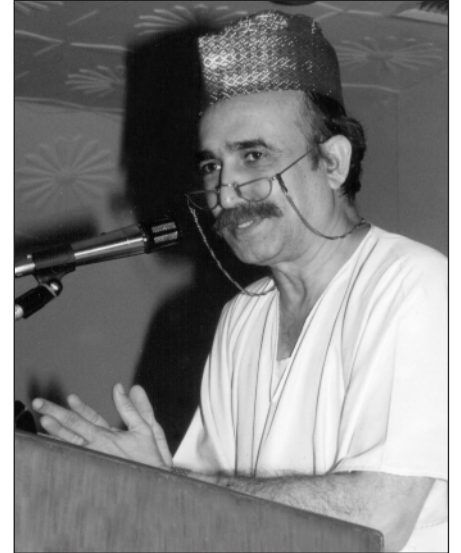
‘সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিই দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করে’

‘সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিই দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান।
দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি সমস্যাকে সঠিক
দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পদক্ষেপ নিয়ে নতুন
সম্ভাবনার বীজে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।
ব্রাহ্ম দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যাকে সংকটে রূপান্তরিত
করে। আর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যাকে পরিণত
করে নতুন সম্ভাবনায়।’

গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক গত
৯ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রাজশাহী কেন্দ্র
আয়োজিত গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে একথা বলেন।
‘দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবিলায় দৃষ্টিভঙ্গি অটো-
সাজেশন ও মনছবি’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে পৌনে
দুইশত কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট অংশগ্রহণ করেন।

গুরুজী বলেন, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি
সমস্যা নিয়ে অহেতুক টেনশন করে আমরা জটিল
করে তুলি। তা না করে আমরা যদি সরাসরি
আসল সত্যটিকে বের করতে চেষ্টা করি, আসল
সত্যটিকে জানতে, বুঝতে চেষ্টা করি এবং তার পর
বাস্তবতার আলোকে সে সত্যটিকে বিশ্লেষণ করি এবং
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিই, তাহলেই সমস্যার সমাধান
বেরিয়ে আসবে।

সারাদিনব্যাপী রাজশাহী পর্যটন মোটеле অনুষ্ঠিত এ ওয়ার্কশপে গুরুজী আকর্ষণীয় আলোচনা ছাড়াও
চারটি বিশেষ মেডিটেশন পরিচালনা করেন।



২৬ অক্টোবর ঢাকায়

কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ

আগামী ২৬ অক্টোবর, শুক্রবার, সকাল ১০টা থেকে
সারাদিনব্যাপী ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে
‘দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবিলায় দৃষ্টিভঙ্গি অটো-সাজেশন ও
মনছবি’ শীর্ষক গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে। এই
ওয়ার্কশপে আট শত গ্রাজুয়েট অংশগ্রহণ করবেন বলে
আশা করা যাচ্ছে। গুরুজী শহীদ আল বোখারী
মহাজাতক ওয়ার্কশপ পরিচালনা করবেন। একই বিষয়ের
উপর অনুষ্ঠিত এটি হবে দ্বিতীয় ওয়ার্কশপ। ইতঃপূর্বে এই
ওয়ার্কশপের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এ বছরের ২১
ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ও ৯ অক্টোবর রাজশাহীতে।

বছরের শেষ কোর্স

কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সের ১৩৪
ব্যাচের ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে আগামী নভেম্বরের ২,
৩ ও ৯, ১০। স্থান : কোয়ান্টাম মেডিটেশন হল,
১/১ পায়োনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
নাম নিবন্ধনের জন্যে যোগাযোগ করুন : যোগ
ফাউন্ডেশন, ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।

উল্লেখ্য, এটিই এ বছরের শেষ কোর্স এবং
৪৫০০ টাকা ফি-তে কোর্স করার এটি শেষ
সুযোগ। ২০০২ সালের জানুয়ারী থেকে কোর্স ফি
হবে ৫০০০ টাকা। তবে ৪৫০০ টাকা জমা দিয়ে
অগ্রীম কার্ড সংগ্রহ করে রাখলে আগামী বছরের
যে কোনো ব্যাচে অংশ নেয়া যাবে।



মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখেছি আমি

লস্কর শাহীর শোভন

মৃত্যুকে খুব কাছ
থেকে দেখেছেন
আপনারা? সম্ভবতঃ

অধিকাংশই বলবেন, 'না'। কারণ জীবন-মরণের
সন্ধিক্ষণ থেকে ফিরে আসা মানুষের সংখ্যা এই
বাস্তব জগতে খুব বেশি নয়। কিন্তু সেই বিরল
কিছু সৌভাগ্যবান মানুষের মধ্যে আমি একজন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে বেশ
কয়েকদিনের জন্যে যেতে হয়েছিল আমাকে, এ
বছরের জুন মাসে। কয়েকদিন পর হঠাৎ বেশ
জ্বর এলো। সৌভাগ্যক্রমে সেই প্রত্যন্ত
এলাকায়ও একজন এমবিবিএস ডাক্তার পেয়ে
গেলাম। তিনি ম্যালেরিয়া সন্দেহ করে Avloquin
প্রেসক্রাইব করলেন। প্রচণ্ড জ্বর, কিছুই খেতে
পারছিলাম না। আমি আমার মায়ের খুব
আদরের ছেলে। মাকে খুব মনে পড়ছিল। তাই
কী যে হলো! অনেকটা জোর করেই অসুস্থ শরীর
নিয়ে ঢাকায় রওনা হলাম।

জুলাইয়ের চার তারিখে ঢাকায় ফিরে এলাম।
জ্বর-টর ছেড়ে গেল। খাওয়া দাওয়াও করছিলাম।
মনে হচ্ছিল যেন সাধারণ সর্দি-জ্বরই হয়েছিল
এবং এখন ভালো হয়ে গেছি। কিন্তু ৭ তারিখে
শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এলো। ১০৪/১০৫ ডিগ্রীর
নিচে নামছিল না তাপমাত্রা। ডাক্তারকে দেখলাম,
তিনি কিছু ওষুধ দিলেন। কিন্তু কিছুতেই জ্বর
নামছে না। সপ্তাহখানেক পর একদিন বাথরুমে
অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ পড়ে থাকার
পর মনে হলো— আমার যেন কিছুই মনে নেই।
সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছিল। কেমন করে যে
বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম, বলতে পারব না।
সম্ভবতঃ আমার চেহারা এমন কিছু ছিল যা
দেখে আমার মা ভাবলেন মারাত্মক কিছু হয়েছে।
সাথে সাথেই আমাকে গুলশানে কেসি
মেমোরিয়াল ক্লিনিকে নেয়া হলো এবং ডাক্তাররা
ভর্তি করে নিলেন। আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম।
কারণ আমি অসুস্থ খুবই তা ঠিক, কিন্তু তাই বলে
হাসপাতাল! সবসময়তো অন্যদেরকেই
হাসপাতালে ভর্তি হতে দেখেছি, আমি এই বয়সে
হাসপাতালে থাকতে এসেছি, এটা যেন বিশ্বাস
হচ্ছিল না। তবে কি ...?

সেখানে কিছু ল্যাবরেটরী টেস্ট করা হলো,
ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে গেলেন ডাক্তাররা। সবাইকে
কেমন গম্ভীর দেখাচ্ছিল। মায়ের জন্যে কেন যেন
খুব খারাপ লাগছিল। পরদিনই আবার শুনলাম
আমাকে ধানমন্ডির শ্মশিতা হাসপাতালে
এডমিশন নিতে হবে। ইতোমধ্যেই আমাকে
কৃত্রিম শ্বাস যন্ত্রের সাহায্য নিতে হচ্ছিল নিঃশ্বাস

নেবার জন্যে।

শ্মশিতা ক্লিনিকে আমাকে এবার আর
সাধারণ কোনো কেবিনে নয়, একেবারে
ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হলো।
বিশিষ্ট রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার ইউনুস
জানালেন আমার সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হয়েছে।
পরে শুনেছি, এটি খুব খারাপ ধরনের একটি
ম্যালেরিয়া, যাতে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় জীবাণু
দ্বারা। শতকরা মাত্র ২০ ভাগ সম্ভাবনা থাকে
বাঁচার এবং তাও খুব ধীরে ধীরে। ভালো হয়ে
যাওয়ার পরও কিছু কিছু ক্ষতিকর প্রভাব— যেমন
স্মৃতিবিভ্রাট, দুর্বলতা, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া
ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। তবে তখনও এসব
কিছুই জানতাম না। যখন চোখ মেলতাম,
দেখতাম ইনটেনসিভ ইউনিটের কাচের ওপাশে
আমার উদ্ভিগ্ন আত্মীয়-স্বজনদের মুখ। আর
ভাবতাম এদের সবাইকে ছেড়ে, আমার মাকে
ছেড়ে, কোয়ান্টামের অসংখ্য শুভার্থীকে ছেড়ে
বোধ হয় আমাকে একা চলে যেতে হবে অন্য
কোথাও। কিন্তু আবার খুব জানতে ইচ্ছে করতো
সেই যাওয়াটা কবে! আজই, নাকি কাল বা পরশু!
আজ যে দিনের আলো দেখেছি, তাকি কালও
দেখতে পাবো? নাকি ...।

জীবনকে বোধ হয় এত ভালো কখনো বাসি
নি। আমার জীবনটা খুবই সাধারণ। বিখ্যাত কেউ
নই আমি। আমার বাবা নেই। ছোট্ট ভাইটা
পড়াশোনার জন্যে পাড়ি দিয়েছে সুদূর
আমেরিকায়। মাকে নিয়েই ছোট্ট এক সংসারে
আমার জীবন যাপন। কিন্তু সেই জীবনটাও হয়ে
উঠল ভীষণ মূল্যবান। মনে হলো কত কিছু করার
ছিল; কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না!

এর মধ্যে মারাত্মক জটিলও দেখা দিল।
ইউরিনের সাথে ব্লাড যেতে শুরু করলো।
সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার যতগুলো খারাপ দিক
আছে, এক এক করে প্রকাশ পাচ্ছিল। ওদিকে
আবার খুবই প্রয়োজনীয় একটি ইনজেকশন
Paluther — যেটিকে ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব
করেছিলেন— সেটি কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না।
সব জায়গায় খোঁজার পর একটি ওষুধ কোম্পানী
জানালো যে এ মুহূর্তে বাংলাদেশের কোথাও
নেই, তবে ভারত থেকে হয়তো একদিনের
নোটিশে আনিয়ে দেয়া যেতে পারে। ভীষণ
ঘাবড়ে গেলাম। আর আমার এ সময়কার
মানসিক দুর্বলতা আর হতাশাকে ষোলকলায় পূর্ণ
করতেই বোধ হয় মারা গেলেন আমার পাশের
বেডের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সাদা চাদরে তাকে
ঢেকে যখন রুম থেকে বের করে নেয়া হচ্ছিল,

তখন আমার মনের যে অবস্থা, তা বলে বোঝাতে
পারব না।

১৮ জুলাই সারাটা দিন কেটে গেল প্রচণ্ড
শারীরিক যন্ত্রণা আর মানসিক হতাশা নিয়ে।
রাত্রিবেলা সবুজবাগ শাখার পরিচালক মাসুদা
আক্তার আবেদীন এলেন। আমার মাথায় হাত
বুলিয়ে দোয়া করলেন, আর জানালেন বুধবারের
মেডিটেশনে আমার জন্যে দোয়া করা হয়েছে।
গুরুজী নিজে এ মেডিটেশন পরিচালনা করেছেন
এবং একাত্তরটিতে অত্যন্ত আবেগঘন এক
মেডিটেশনে কোয়ান্টাম মাস্টাররা আমার
আরোগ্যলাভের জন্যে দোয়া করেছেন। সেই
মুহূর্তেই অনুভব করলাম পরম করুণাময় চাইলে
সব কিছুই তো হতে পারে। আমার অসুস্থতা যত
দুরারোগ্যই হোক না কেন, এতগুলো মানুষ যখন
আন্তরিকভাবে দোয়া করেছেন, তখন স্রষ্টার
রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার তো কোনো কারণ
নেই। অনুভব করলাম, আমি আর একা নই,
আমি সুস্থ হতে চাই, কারণ আমার জীবনকে
আমি সৃষ্টির কল্যাণে উৎসর্গ করেছি।

স্রষ্টার কাছে সুযোগ চাইলাম আমি।

মানসিক নিঃসঙ্গতা যখন কেটে গেল,
শারীরিক ভাবেও একটু একটু ভালো বোধ
করলাম। পরদিন, অর্থাৎ ১৯ জুলাই দুপুর নাগাদ
ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট ছেড়ে ফিরে এলাম
সাধারণ কেবিনে। পরবর্তী দশ দিনে দ্রুত সুস্থ
হতে লাগলাম। এত দ্রুত যে, ডাক্তাররাও বিস্মিত
হচ্ছিলেন— এত তাড়াতাড়ি সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া
থেকে ভালো হওয়া কী করে সম্ভব? কিন্তু আমি
ভাবতাম, রহস্যময় এ জগতের সবকিছুকেই কি
চর্মস্ফূটর জ্ঞান দিয়ে সম্ভব/অসম্ভব বিচার করা
যায়? তাহলে তো পৃথিবীটা হয়ে যেতো একটা
পড়ে ফেলা বইয়ের মতো একঘেয়ে। স্রষ্টা
সবসময়ই আমাদের প্রতি করুণাময়। কিন্তু কিছু
কিছু ঘটনা এমনভাবে ঘটে, যাতে তাঁর মহিমা
নতুন করে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়,
কৃতজ্ঞতায় এমনিতেই মাথা নুয়ে আসে।

২৮ জুলাই ডাক্তাররা নিশ্চিত্তে আমাকে
রিলিজ করে দিতে রাজী হলেন। বাড়িতে ফিরে
এলাম এবং নিয়মিত ওষুধ ও পথ্য গ্রহণ করে
এখন পুরো সুস্থ আমি। হারানো ওজনও ফিরে
পেয়েছি।

তাই বলছিলাম, মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে
দেখার এক বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি
অনুভব করেছি একাত্তর প্রার্থনার শক্তিকে। কারণ
প্রাণঘাতী এই রোগটি থেকে কোনো রকম
পাশ্চাত্যিক্রিয়া ছাড়াই দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়াটাকে
আমি আর কোনো কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করতে
পারি না শত শত গ্রাজুয়েটের আন্তরিক প্রার্থনার
শক্তি ছাড়া। স্রষ্টার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ,
কোয়ান্টামের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর কাছে আমি
কৃতজ্ঞ। নতুন যে জীবন পেয়েছি, তাকে সৃষ্টির
কাজেই উৎসর্গ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি আমি।

[লস্কর শাহীর শোভন ২৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অভাবনীয় সাফল্য

বৈদ্যুতিক মিটার তৈরী করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম

এস.এম. সাজেদুল হাসান নাসিম



পরিমাণ বিদ্যুৎ আপনি পাবেন। কার্ড শেষ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাবে।

তবে এ দু'টো সুবিধা সম্বলিত মিটার বাইরের দেশগুলোতে আছে। সেখানে নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে প্রত্যেক বাসাবাড়ির মিটার তারের মাধ্যমে অফিসের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু সেরকম মিটারের ব্যবস্থা বাংলাদেশে করতে গেলে বাইশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ পড়বে। আর এ মুহূর্তে তারের মাধ্যমে সংযুক্ত করাটাও সম্ভব নয়। তাই আমাদের সিস্টেমে তারের কোনো প্রয়োজন না রেখে আমরা শুধু আপনার মিটারের জায়গায় আমাদের মিটারটি বসিয়ে দেব, সেক্ষেত্রে আমাদের মিটারের দাম পড়বে দু'হাজার টাকা। সম্ভবতঃ এটিই তাদেরকে বিস্মিত করেছে।

এবার মেডিটেশন করার পরের সাফল্যের কথা বলি। ৪ অক্টোবর ২০০১, আমেরিকার শিকাগোস্থ এক প্রসিদ্ধ ও বিলাসবহুল হোটеле আমাদের পুরস্কার দেয়া হবে। সেপ্টেম্বরে আমরা শিকাগোতে যাবো এবং আমাদের কাজটি তুলে ধরবো। আয়োজকরা জানিয়েছিলেন যে যাতায়াত ভাড়ার তিন-চতুর্থাংশ তারা দেবেন আর বাকি এক-চতুর্থাংশ আমাদেরকে বহন করতে হবে। আর এই এক-চতুর্থাংশ মানে প্রায় আড়াই লাখ টাকা। 'সিমেন্স' কোম্পানী আমাদের কাজটিকে স্পন্সর করেছিল এবং আশ্বাস দিয়েছিল যে, তারাও কিছুটা খরচ বহন করবে। কিন্তু কিছু দিলেও আমাদের আরও এক/দুই লাখ টাকা ঘাটতি থেকে যায়। সিমেন্স এর এমডির সাথে আমাদের এ ব্যাপারে কথা বলার ব্যবস্থা হলো। এমডি সাহেব একজন জার্মান ভদ্রলোক। নাম পিটার অলব্রিজ। মতিঝিলের অফিসে দেখা করতে গেলাম। তখন গুরুজীর কথা মনে হলো। আমি কোয়ান্টা ভঙ্গি করে রুমের ভেতরে ঢুকলাম, যেখানে এমডি ছাড়াও আরও দু'জন জার্মান ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে অভিনন্দন জানানেন। কিন্তু আবার নিজেরা কথা বলতে লাগলেন। আমরা কিছু বলার সুযোগই পাচ্ছিলাম না। একটু পরে আমাদেরকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি বললেন, "আমি একঘণ্টা আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আপনাদেরকে ১৫০০ ডলার বাড়িয়ে দেব।"

কাজেই এখন আমার মধ্যে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে যে, আমি নিজেকে যা পাওয়ার উপযুক্ত মনে করবো, তা-ই পাবো।

[এস.এম. সাজেদুল হাসান নাসিম বুয়েটে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। ১২৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

আমি প্রথমেই গুরুজীর সাথে আমার পরিচয়ের কথা বলি। আমার ছোটভাই দু'বছর আগে 'কোয়ান্টাম মেথড' বইটি নিয়ে আসে। বইটি পড়ে আমি তেমন কিছুই বুঝতে পারি নি, কারণ নিউরন, ব্রেন ইত্যাদি ব্যাপার আমি বুঝি না। আমি ইলেকট্রিকের ছাত্র। প্রথমবার পড়বার ছ'মাস পর আবার পড়লাম। তিনমাস পর আবার। একটু একটু বুঝতে পারছিলাম যে, বিশ্বাস করলে মানুষ সবই পারে।

ইতোমধ্যে আমেরিকায় Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE)-এর অঙ্গসংগঠন Industry Applications Society (IAS) বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্যে একটি বড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, যা 'Myron Zucker Student Design Contest' নামে খ্যাত। এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকান ছাত্ররাই সব সময় প্রথম হয়। তাদেরকে অর্থ সাহায্য করে NASA বা বড় কোনো কোম্পানী। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্ররা কখনোই অংশ নেয়ার চিন্তাও করে নি। কারণ বাংলাদেশে বসে হার্ডওয়্যার-এর কাজ করা যায় না, সফটওয়্যার-এর কাজ করা যায়। আমরা বুয়েটের তিন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম আমরা আমাদের কাজটা এই প্রতিযোগিতায় সাবমিট করবো।

বুয়েটে যারা পড়াশোনা করেছেন বা করছেন তারা জানেন, সেখানে অসম্ভব চাপ, বিশেষ করে শেষ সপ্তাহে থাকে নাতিশ্রাস্ত অবস্থা। সেই সপ্তাহেই প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী পঁচিশ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট আমরা তৈরি করে পাঠিয়ে দিলাম।

বাংলাদেশ থেকে এর আগে কেউ কখনো এরকম প্রতিযোগিতায় মেধাস্থান অর্জন করা দূরে থাক, অংশই নেয় নি। সেখানে আমরা অন্তত অংশগ্রহণ করলাম। এটা ছিল আমাদের সম্ভৃতি। কিন্তু মেডিটেশন কোর্সে অংশ নেয়ার একদিন আগে জানতে পারলাম, আমরা বিশ্বে প্রথম হয়েছি। এটি বাংলাদেশের জন্যে অত্যন্ত বিরল এক সম্মান এবং

আমেরিকানরা অবাক হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশে থেকে হার্ডওয়্যার-এর কাজ করা যায়।

তবে এটি সম্ভব হয়েছে বিশ্বাসের কারণে। কারণ কাজটি করার সময় আমাদের এত পরিশ্রম করতে হয়েছে যে, সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ল্যাবে একটানা কাজ করতে হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, এত খাটুনি খাটছি, এর ফল তো কিছু পাবোই। সেখানে প্রথম হয়ে গেলাম। সেজন্যে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছি। গুরুজীর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ যে, কোয়ান্টাম মেথড বইটি পড়েই আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, আমি পারবো।

এবারে আমাদের কাজের বিবরণ দিই। আমরা বাসাবাড়িতে যে মিটারগুলো ব্যবহার করি, এগুলো এ্যানালগ মিটার। এই এ্যানালগ মিটারের ভিতর চাকাগুলো ঘুরতে থাকে এবং নাম্বার অর্থাৎ ইউনিট উঠতে থাকে। যত ইউনিট খরচ হবে, সেই হিসেবে ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে হয়। যেমন : প্রতি ইউনিটে খরচ যদি তিন টাকা হয় এবং মিটার রিডিং যদি তিনশ ইউনিট হয়, তাহলে বিল হবে নয়শ টাকার। কিন্তু এই এ্যানালগ মিটারের কিছু অসুবিধা আছে। যেমন : ভিতরের চাকার সামনে যদি চুম্বক ধরা হয়, তাহলে চাকা ঘোরা বন্ধ হয়ে যাবে এবং রিডিং উঠবে না। আবার যারা বাইরে থেকে রিডিং নিতে আসে তারাও চাইলে রিডিং বদলে দিতে পারে, ফলে ব্যবহারকারীরা বিল বকেয়া রাখার সুযোগ পান।

আমরা এই মিটার রিডিং ব্যবস্থাকে প্রথমত ডিজিটাল করেছি; অর্থাৎ ক্যালকুলেটরে যেভাবে নাম্বার ওঠে। আর দ্বিতীয়ত প্রি-পেইড সিস্টেম করেছি। মোবাইল ফোন-এর সুবাদে প্রি-পেইড সিস্টেম শব্দটি অনেকের কাছেই পরিচিত। অর্থাৎ ফোন-এর মতোই কার্ড সিস্টেমে যত ইউনিট কারেন্ট আপনি প্রতি মাসে ব্যবহার করতে চান, সেই ইউনিটের কার্ড বাজার থেকে কিনতে পারবেন এবং বাসায় এসে নাম্বারটা মিটারে দিয়ে দিলে তত

কোয়ান্টাম চিন্তা বা মৌন সাধনা : আত্মোপলব্ধি ও ধ্যানের গভীরতা বৃদ্ধির জন্যে কেন্দ্রীয় ধ্যানঘরে প্রতি শুক্র ও শনিবার চিন্তা বা মৌন সাধনা অনুষ্ঠিত হয়। সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে ৫.৩০ মিনিট।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম : আত্মিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্যে শারীরিক সুস্থতাও অপরিহার্য। একারণেই কেন্দ্রীয় দফতরে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের আয়োজন করা হয়েছে। সময় : বিকেল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০ মিনিট। কোর্স ফি : গ্রাজুয়েট ৫০০ টাকা ও নন গ্রাজুয়েট ১০০০ টাকা। পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে।

যৌথ মেডিটেশন : একক মেডিটেশনের চেয়ে

কেন্দ্রীয় কার্যক্রম

যৌথভাবে মেডিটেশনে অংশগ্রহণ অনেক বেশি ফলপ্রসূ। তাই ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় ধ্যানঘরে আয়োজন করেছে যৌথ মেডিটেশনের। প্রতি সোমবার সকাল ১১.৩০, বিকেল ৫টা ও সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে সাপ্তাহিক যৌথ মেডিটেশন হয়।

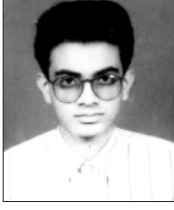
গুরুজী ও মা-জীর সাথে সাক্ষাত : শ্রদ্ধেয় গুরুজী প্রতি সোমবার এবং শ্রদ্ধেয়া মা-জী প্রতি রবি ও সোমবার ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত দান করেন।

সাইকি কোর্স ও হিলিং মেডিটেশন : অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা শাণিত করার জন্যে কেন্দ্রীয় ধ্যানঘরে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সাইকি কোর্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩ মাসে সপ্তাহে ১ দিন করে মোট ১২টি ক্লাসে এই কোর্স সম্পন্ন হয়। কোর্স ফি : শিক্ষার্থী ৫০০ টাকা, পেশাজীবী ১০০০ টাকা। সাইকি কোর্স শেষে অন্যের রোগ নিরাময় ও কল্যাণ কামনায় হিলিং মেডিটেশন অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা-সেলের কার্যক্রম : সারা দেশে বিভিন্ন শাখা-সেলে প্রতি শুক্রবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে যৌথ মেডিটেশন অনুষ্ঠিত হয়। মেডিটেশন শেষে বিভিন্ন আত্ম উন্নয়নমূলক বিষয়ে আলোচনা হয়।

সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৌশলী সোহেল আযম

জীবন যখন এগুতে থাকে, তখন একটু একটু করে জটিলতাও বাড়ে। এটাই বোধ হয় জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। সময়ের সাথে সাথে আমিও তাই পারিবারিক ও অন্যান্য অনেক সমস্যা জড়িয়ে গেলাম। কিন্তু এর মধ্যেও একটা ইচ্ছা ছিল যে, না, যেভাবেই হোক আমাকে টিকে থাকতে হবে, আমাকে পেতে হবে। একটা সময় এ কোর্স করলাম এবং বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে, যদি আমি বিশ্বাস করি কোনো কিছু সম্ভব, তাহলেই তা সম্ভব।



আমার মেডিটেশন অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি হলো ধূমপান ছাড়ার মেডিটেশনটি। আমি ১৯৯৩ সাল থেকে অর্থাৎ কলেজের ফাস্ট ইয়ার থেকেই ধূমপান করি বন্ধুবান্ধবদের দেখাদেখি। চেইন স্মোকিং না হলেও দিনে ৭/৮ টা সিগারেট তো চলতোই। কিন্তু সেই মেডিটেশনটি করার পরপরই হলের বাইরে আমি যখন সিগারেট ধরলাম, তখনই মনে হলো গোখরো সাপ আমার ফুসফুসকে ছোঁবল মারছে। এবং কিছুতেই আর সিগারেট খেতে পারলাম না। কোর্সের ৩য় দিন এই মেডিটেশনটি করার পর ৪র্থ দিন পর্যন্ত টানা ২৪ ঘণ্টা আমি আর কোনো সিগারেট ধরাই নি। কিন্তু ৪র্থ দিন বিকেল বেলা ভাবলাম, কী আর হবে, আগের দিন প্রোথাম করেছি, এখন নিশ্চয়ই মন থেকে মুছে গেছে; দেখি একটা সিগারেট ধরিয়ে। সিগারেটে প্রথম টান দেয়ার পরপরই বুকে এমন একটা ব্যথা অনুভব করলাম যে, বাধ্য হলাম ফেলে দিতে। অথচ সেই '৯৩ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই আট বছরে আমার কখনো বুকে ব্যথার এই অভিজ্ঞতা হয় নি।

আমার আরেকটি অভিজ্ঞতা হলো, কোর্সের ৪র্থ দিন কমান্ড সেন্টারে অন্যকে নিরাময় করার সময় আমি আমার মাকে হিলিং করলাম। তখন আমি অনুভব করছিলাম আমার মায়ের মাথার বামদিকে ব্যথা করছে। পরবর্তীতে সাইকি গেমে একজন সতীর্থ আপা যখন শুধুমাত্র নাম, বয়স, ঠিকানা জেনে আমার মাকে অবলোকন করছিলেন, তখন তিনিও মাথার বামদিকে ব্যথার কথা বললেন। পরে বাসায় এসে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনিও বললেন তাঁর ব্যথার কথা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার মা এর আগে কখনও আমাকে বলেননি তাঁর এই সমস্যার কথা, অথচ আমি জানতে পারলাম মেডিটেটিভ লেভেলে। এটিই আমাকে খুব বিস্মিত করেছে। সেই সাথে উপলব্ধি করলাম যে, এত বিপুল শক্তি আমাদের সবার ভেতরেই আছে, শুধু বিশ্বাস করতে পারি না বলে আর নেতিবাচক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকি বলে তা জগত করতে পারি না।

[কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সোহেল আযম ১২৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

ইসলামের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নেই সুমাইয়া সুলতানা

আমার একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, মেডিটেশন কোর্স করলে বোধ হয় ঈমান থাকবে না। পরবর্তীতে আমার বন্ধুরা আশ্বস্ত করায় কোর্সে অংশ নিই। আর কোর্স করে আমার উপলব্ধি হলো, ঈমান-আকীদার সাথে এর কোনো দ্বন্দ্ব নেই, বরং এটি এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোর্স, যা জীবনের ভিত্তিকে গড়ে দিচ্ছে।

[সুমাইয়া সুলতানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ-র ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী। ১৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



আমার জীবনটাই পাল্টে গেছে লিটন অধিকারী

বন্ধুর কাছে এ কোর্সটি সম্পর্কে শুনেই আমি আশার বীজ লালন করছিলাম যে, কোর্সটি একসময় করবো। কোর্সে এসে দেখলাম শুধু আমার মতো ছাত্ররাই নয়—শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী সবাই এ কোর্সে আছেন। কোর্স করতে পারার উপলব্ধিকে ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলতে পারি—এ কোর্স আমার জীবনটাকেই পাল্টে দিয়েছে।

[লিটন অধিকারী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতত্ত্বের ছাত্র। ১৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



‘মানুষ’ মনে হচ্ছে নিজেকে নারায়ণ চন্দ্র সাহা আকাশ

আমার পেশাগত ব্যস্ততা এত বেশি যে, আমার আত্মীয়দের সাথেও দেখা হয় না দিনের পর দিন। কোর্স করার জন্যে সময় বের করতে পারছিলাম না। মূলত স্ত্রীর অনুপ্রেরণায়ই এ কোর্সে অংশ নিয়েছি। অনেকদিন পর মনে হলো যেন কিছু মানুষের সংস্পর্শে সময় কাটালাম। নিজেকেও ‘মানুষ’ মনে হচ্ছে। এখানে এসে আমার আত্মোপলব্ধির দরজা খুলে গেছে।

মেডিটেশন কোর্স করে আমার ভেতরে এই বোধ জন্মেছে যে, আমি মানুষ। সক্রটিস বলেছেন, সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলনের আগ পর্যন্ত জীবনের সার্থকতা নেই। কোয়ান্টাম মেথড জীবনকে সার্থক করে তোলার পথ দেখিয়েছে।

[নারায়ণ চন্দ্র সাহা আকাশ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। ১৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে আমি মুক্ত অনিমা ঘোষ

‘গুরুজী’ নামটি শুনেই আমার চোখে ভেসে উঠেছিল আমাদের হিন্দু পুরাণের কাহিনীতে বর্ণিত গুরুদের কথা—যাদের জট আছে, গৌফ আছে, কোপী বস্ত্র পরিধান করে থাকেন। কিন্তু সরাসরি গুরুজীকে দেখে ভুল ভাঙলো।

আরেকটি ভয় ছিল যে, ধ্যান করলে বোধ হয় সংসার ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। এর কারণ, আমার পরিবারের সদস্যরা কিছুদিন আগে আমাকে এক সাধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সাধু আমাকে দেখে বলেছিলেন, আমার উপরে নাকি দেবতাদের কুদৃষ্টি আছে এবং আমাকে দিয়ে নাকি সংসার ধর্ম হবে না। এসমস্ত কারণে মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত ছিলাম। ঘুমোতে পারতাম না।

কোর্স করে বুঝলাম সংসার ত্যাগ তো নয়ই, বরং সংসারকে আরও ভালোভাবে গড়ার জন্যে এই কোর্স। সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকেও আমি মুক্ত, যা দেবতার কুদৃষ্টির কুসংস্কার হিসেবে আমার মধ্যে দৃঢ়মূল হয়েছিল।

[অনিমা ঘোষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এমকম-এ অধ্যয়নরত। ১৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



অন্যমনস্কতা কেটে গেছে নাজিয়া শারমীন

আগে আমি ভীষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। এমনকি আমি যে অন্যমনস্ক, এটাই বুঝতে পারতাম না। কোর্স করার পর একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। সবকিছুকেই খোয়াল করছি।

এমনকি কেউ কথা বললেও সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনছি। এ এক দারুণ উপলব্ধি।

[নাজিয়া শারমীন ঢাকা কমার্স কলেজে বিবিএ-র ছাত্রী। ১৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



পরীক্ষার ফল ভালো হচ্ছে নাজমুন নাহার মিলি

আমার জীবনে এখন ব্যর্থতার চেয়ে সাফল্যই বেশি। আমি এখন প্রত্যয়ী এবং সাহসী। হীনমন্যতা পুরোপুরি দূর হয়েছে। নিয়মিত আটোসাজেশন এবং মনছবি দেখায় পড়াশোনায় অঞ্চল মনোযোগ দিতে পারছি। পরীক্ষার ফল ক্লাসের অন্যদের চেয়ে ভালো হচ্ছে।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী নাজমুন নাহার মিলি ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



কোয়ান্টাম শিশুকানন



বান্দরবানের লামায় স্থাপিত কোয়ান্টাম শিশুকানন এখন শিশুদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। ত্রিশটি শিশু নিয়ে শুরু হয়েছে শিশুকাননের যাত্রা। এদের অধিকাংশেরই বয়স সাত থেকে বারোর মধ্যে। এদের কারো বাবা নেই আবার কারো মা-বাবা কেউই নেই। কারো কারো মা-বাবা জীবিত থাকলেও পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। তাই কোয়ান্টাম শিশুকানন এই অনাথ শিশুদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে।

শিশুদের আবাসনের পাশাপাশি শিক্ষাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে স্থাপিত হয়েছে স্কুল ঘর। সেখানে আবাসিক শিশুরা ছাড়াও বাইরের

ছেলে মেয়েরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

আগামী দুই/এক মাসের মধ্যে শিশুকাননে বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০-এ। এতে করে শিশুদের খাবার, দৈনন্দিন সামগ্রী এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতে খরচ পড়বে প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বছরে বারো লক্ষ টাকা। শুধু মাত্র শিশুদের জন্যেই ব্যয়িত এ অর্থ সংগ্রহের জন্যে গঠন করা হয়েছে কোয়ান্টাম শিশুকানন ফান্ড।

দুঃস্থ শিশুদের জন্যে সম্প্রতি ফাউন্ডেশন একটি ভিনুধর্মী পদক্ষেপ নিয়েছে। এতে যে কেউ স্বেচ্ছায় অভিভাবকহীন কোমলমতি শিশুদের অভিভাবক হতে পারেন। কোয়ান্টামে এই অভিভাবকে বলা হয় soul father, soul mother, soul brother, soul sister। এ পর্যন্ত যারা soul father, soul mother, soul brother, বা soul sister হয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন জানালেন তাদের অনুভূতির কথা। তাদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ব্লাড ক্যান্সার ও রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এ.বি.এম. ইউনুস।

তিনি বলেন, মানুষ মানুষের জন্যে। আমার সামান্য

অবদানের ফলে এতিম অথচ মেধাবী একটি শিশু যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তবে সেটাই হবে আমার বড় পাওয়া। বড় সমৃদ্ধি। ভাবতে খুবই ভালো লাগছে

যে একটি শিশুর মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে আমি সমাজের জন্যে, দেশের জন্যে কিছু করতে পারছি।



ডা. এ.বি.এম. ইউনুস

স্কলাসটিকা স্কুলের এ্যাডমিনিস্ট্রেটর মিসেস মেহবুবা আরেফীন হায়দার বলেন, অবহেলিত, অনাথ শিশুদের দুঃখ-কষ্ট আমাকে খুব নাড়া দেয়। তাই শিশুকানন কার্যক্রম সম্পর্কে জানার পর soul mother হতে রাজী হয়ে যাই। আমার মতে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের প্রত্যেকেরই মানবিক দায়িত্ব হিসেবে এজাতীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া উচিত।

গৃহিণী মমতাজ খন্দকার বলেন, ছাত্রী থাকাকালীন লেখাপড়ার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিতাম। অন্যের কষ্টকে কিছুটা হলেও দূর করে যখন তার হাসি মুখ দেখতাম তখন খুব ভালো লাগতো। আমার কাছে সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে ইবাদত করাটা সবসময়ই গুরুত্ব পেয়েছে। তাই শিশুকাননের সাথে নিজেকে একাত্ম করতে পেরে আমি আনন্দিত।

শুধু বড়রাই নন, শিশুকাননের শিশুদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে ৮ বছর বয়েসী তাসনিম আল মামুন আলভীও। নিজে একটি শিশু হয়ে আর একটি শিশুর soul brother হতে পেরে সে ভীষণ খুশি।

এ অভিভাবকত্ব দত্তক গ্রহণ নয়। তাই অভিভাবকত্বের কোনো আইনগত দায়িত্ব কারও উপর বর্তাবে না। পুরো বিষয়টিই আত্মিক ও মানবিক। প্রতিমাসে ১ থেকে ২ হাজার টাকা দিয়ে যে কেউ সরাসরি একটি শিশুর অভিভাবক হতে পারেন।

অভিভাবকত্ব গ্রহণের পর ইচ্ছে করলে কেউ শিশুটিকে বিভিন্ন ছুটিছাটায় নিজের কাছে এনে রাখতে পারেন। শিশুটির সাথে চিঠি বিনিময় করতে পারেন। সঙ্গে ছবিও রাখতে পারেন।

বঞ্চিত, অবহেলিত, অনাথ, শিশুদের আলোকিত মানুষ করে গড়ে তোলাই কোয়ান্টাম শিশুকাননের লক্ষ্য। সবার আন্তরিক চেষ্টা আর সামর্থ্য অনুসারে সহযোগিতাই পারে প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা এই কোমলমতি শিশুদের অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করতে।

প্রতিবেদক : রোকেয়া হক



দুই মেয়ের সঙ্গে ডা. রশীদ হায়দার ও মিসেস মেহবুবা আরেফীন হায়দার।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন : বিভিন্ন শাখা-সেলের বার্ষিক ওয়ার্কশপ

সবুজবাগ শাখা

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সবুজবাগ শাখার বার্ষিক ওয়ার্কশপ-২০০১ অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬ মার্চ। সকাল ৯টায় পরিচালকের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ওয়ার্কশপ শুরু হয়। এরপর ‘কেন মেডিটেশন’ বিষয়ে আলোচনা করেন সোনালী ব্যাঙ্ক স্টাফ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক খাত কর্মসূচির কনসালট্যান্ট এবং বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কনসালটেন্ট শ্রী সুকুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, সাফল্য এবং আর্থিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্যে মেডিটেশন চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান আত্ম উন্নয়নের জন্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনায় বলেন, একা একা ভালো থাকা যায় না। ভালো থাকার জন্যে চারপাশে ভালো মানুষের প্রয়োজন, সং সংঘের প্রয়োজন।

আনন্দঘন এ ওয়ার্কশপে অভিজ্ঞতা বর্ণনা পর্বে সরদার মোঃ নূরুজ্জামান, ডা. এ.এ.আর.এম. কায়স, কামরুল মুনীর, মীর রফিকুল ইসলাম, বেগম খাদিজা মাহতাব, রাবেয়া নাজনীন প্রমুখ অংশ নেন।

‘পরিকল্পিত জীবন যাপনের গুরুত্ব : কোয়ান্টাম জীবন যাপনের বিজ্ঞান’ বিষয়ে আলোচনা করেন মোঃ রেজাউল হাসান।

ওয়ার্কশপে মোট তিনটি মেডিটেশন অনুষ্ঠিত হয়। আখেরী মেডিটেশন পরিচালনা করেন শাখার পরিচালক মাসুদা আক্তার আবেদীন।

সৃষ্টির সেবা, অর্থায়ন-বাস্তবায়ন, মাটির ব্যাঙ্ক, পুনর্বাসন ও রক্তদান কার্যক্রম প্রসঙ্গে মওলানা ছায়ীদুল হক মুষ্টি চাল, গ্রাম পুনর্বাসন কর্মসূচি, লামা, কোয়ান্টাম মেডিটেশন কেন্দ্র, রাজশাহীর আলোআশা স্কুল, মাটির ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন পরিচালক মাসুদা আক্তার আবেদীন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মোঃ রেজাউল হাসান।



সবুজবাগ শাখার ওয়ার্কশপে আলোচনা করছেন শ্রী সুকুমার চক্রবর্তী।

মতিঝিল শাখা

সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পরিবেশে গত ৩০ মার্চ ডেমরাস্থ কিউট ফিশিং পার্কে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মতিঝিল শাখার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বার্ষিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালকের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ ওয়ার্কশপ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এক নতুন অনুভূতির সৃষ্টি করে।

ডেবটেক-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ফেরদৌসী বেগম ‘কেন মেডিটেশন’ বিষয়ে আলোচনায় মেডিটেশনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

‘পরিকল্পিত জীবন যাপনের গুরুত্ব : কোয়ান্টাম জীবন যাপনের বিজ্ঞান’ বিষয়ে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি ও পালি বিভাগের অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। তিনি সনাতন ধর্মের দিকনির্দেশনার সাথে কোয়ান্টাম দিক নির্দেশনার সামঞ্জস্যের কথা তাঁর আলোচনায় বিশদভাবে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে মোট চারটি মেডিটেশন হয়। নিবিড় প্রকৃতির ছায়ায় প্রতিটি মেডিটেশনই সবার কাছে নতুন রূপে অনুভূত হয়। আখেরী মেডিটেশন পরিচালনা করেন শাখার পরিচালক অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব।

ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় পাঠচক্রের পরিচালক মওলানা ছায়ীদুল হক ‘আত্ম উন্নয়নের জন্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা : কোয়ান্টাম মডেল ব্যাখ্যা’ শীর্ষক আলোচনায় কোয়ান্টাম মডেল কি এবং তার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ বক্তা স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অন্যতম সমন্বয়কারী লোকমান হোসেন সৃষ্টির সেবা, অর্থায়ন-বাস্তবায়ন, মাটির ব্যাঙ্ক, পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ের বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা এবং বর্তমানে তার পরিধি ও ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করেন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন শাখার উপদেষ্টা এবং স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের পরিচালক কাজী মাহতাব উদ্দীন আহমদ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কোয়ান্টাম মাস্টার মরহুম আফজাল হোসেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন কোয়ান্টিয়ার দিল আফরোজ মোনা এবং ইশরাত জাহান।

হাতিরপুল সেল

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ শুক্রবার হাতিরপুল সেল-এর বার্ষিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় সাইন্স ল্যাবরেটরিস্থ ব্যান্ডক অভিট-রিয়ামে। সকাল ১০টায় শুরু হওয়া



মতিঝিল শাখার ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন শাখার উপদেষ্টা এবং স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের পরিচালক কাজী মাহতাব উদ্দীন আহমদ।

এ ওয়ার্কশপে গ্রাজুয়েট ও অতিথি মিলিয়ে প্রায় দু’শ অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অন্যতম সমন্বয়কারী জহিরুল ইসলাম খ্রিস্ট-এর উপস্থাপনায় প্রথমেই ‘কেন মেডিটেশন’ বিষয়ের উপর আলোচনা করেন হাতিরপুল সেলের উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি ও পালি বিভাগের অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। তিনি বলেন, “আপনি যদি আপনার মনটাকে নিয়ন্ত্রণে এনে আপনার কাজে নিবিষ্টভাবে নিয়োজিত করতে পারেন, তাহলেই সফলতা আপনার দ্বারে আসবে। মেডিটেশন এই সাফল্যের দ্বারেই আপনাকে নিয়ে যাবে।”

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান তাঁর বক্তব্যে ওয়ার্কশপের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং সেলের সাংগঠনিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন ও সেলের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

ফাউন্ডেশনের বিশুদ্ধ খাবার পানি কার্যক্রমের পরিচালক নাসিম উদ্দিন বাবু, কোয়ান্টাম মাস্টার হাসান শরিফ জয় এবং মহাখালী শাখার পরিচালক মীর রফিকুল ইসলাম মেডিটেশনের মাধ্যমে তাদের প্রাপ্তি ও সফলতার কথা এবং অভিজ্ঞতার অনুভূতি বর্ণনা করেন।

‘পরিকল্পিত জীবন যাপনের গুরুত্ব : কোয়ান্টাম জীবন যাপনের বিজ্ঞান’ বিষয়ে আলোচনা করেন সবুজবাগ শাখার পরিচালক মিসেস মাসুদা আক্তার আবেদীন।

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অন্যতম সমন্বয়কারী লোকমান হোসেন সৃষ্টির সেবা, অর্থায়ন-বাস্তবায়ন, মাটির ব্যাঙ্ক, পুনর্বাসন বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি লামা মেডিটেশন সেন্টারকে ‘কোয়ান্টাম শক্তি কেন্দ্র’ হিসেবে উল্লেখ করে সেখানকার কার্যক্রমের বিবরণ দেন।

ওয়ার্কশপের তিনটি মেডিটেশনের মধ্যে আখেরী মেডিটেশন পরিচালনা সহ সবার কল্যাণ কামনা করে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মা-জী মাদাম নাহার আল বোখারী।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন হাতিরপুল সেলের পরিচালক মোঃ মমিনুল ইসলাম রিংকু, লায়লা আক্তার লিংকু এবং ফাতেমা ইসমত জেরীন মুন।

প্রতিবেদক : কামরুল কাদের চৌধুরী

মহাপ্রয়াণ

একজন সৎ মানুষের জন্যে শোকগাথা
চলে গেলেন মো. আমানউল্লাহ



কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট
মোঃ আমানউল্লাহ
আর নেই। ২০০০
সালের ৩ সেপ্টেম্বর
মাত্র ৪৩ বছর বয়সে
তিনি ইন্তেকাল
করেন। (ইন্সলিগ্নাহি
..... রাজিউন।)
মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী,
এক কন্যা ও দুই

পুত্র এবং অন্যান্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

কঠিন সংগ্রামী এক পুরুষের জীবন ছিল জনাব
আমানউল্লাহর। ১৯৫৮ সালের ২৯ আগস্ট কুষ্টিয়ার
শিলাইদহে খুব দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে
তঁার জন্ম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদার
বাড়ির খুব কাছেই ছিল তাঁদের বাড়ি। কিন্তু
কবিতার মতো ছন্দোময় জীবন তিনি যাপন করতে
পারেন নি।

দারিদ্র্যের কারণে খুব কষ্ট করে লেখাপড়া
করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু অসাধারণ মেধাবী এক
ছাত্র হিসেবে তিনি শিক্ষাঙ্গণের সিঁড়ি একের পর
এক পেরোতে লাগলেন।

লেখাপড়া শেষ করে জনাব আমানউল্লাহ
প্রথমে ব্যাক্সার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে
১৯৮২-এর ব্যাচে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে
ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ পান। মৃত্যুর আগ
পর্যন্ত একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে
তিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেসময় তিনি
ছিলেন প্রাথমিক ও গণস্বাস্থ্য বিভাগের সিনিয়র
সহকারী সচিব।

জনাব আমানউল্লাহ কর্মজীবনে এবং
ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত সৎ। একজন ধর্মপ্রাণ
মানুষ হিসেবে তিনি মনে করতেন সৎ উপার্জন
একজন বিশ্বাসীর বিশ্বস্ততার অন্যতম প্রমাণ।

উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা হওয়ার কারণে
অনেক রকম প্রলোভন, চাপ, হুমকি এসেছে তাঁর
উপর। বহুবার। কিন্তু তিনি কখনো নতি স্বীকার
করেন নি। মৃত্যুর পর তাঁর জন্যে যে স্মরণসভা
হয়েছিল, সেখানে পরিবার ও স্বাস্থ্যকল্যাণ
মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বলেছিলেন, “আমানউল্লাহ
ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যে তার বিশ্বাস অনুযায়ী
শুধু নিজে কাজ করতেন তা-ই নয়, অন্যকেও সেই
বিশ্বাসের পথে চালিত করতে পারতেন। সততা ও
সাহসের এমন দুর্লভ সমন্বয় খুব কম লোকের
মধ্যেই দেখা যায়।

জনাব আমানউল্লাহ তাঁর কর্মজীবনে অনেক
বড় বড় প্রলোভনকে অবলীলায় এড়িয়ে গেছেন।
যমুনা সেতু নির্মাণের সময় যে জমি অধিগ্রহণ করা
হয়েছিল, তার বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণের অর্থ

বরাদ্দে যাতে কোনো অনিয়ম না হয়, সেজন্যে
সিরাজগঞ্জে জনাব আমানউল্লাহকে অতিরিক্ত জেলা
প্রশাসক (রাজস্ব) হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া
হয়েছিল। তিনি তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত সততা ও
নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিলেন।

জনাব আমানউল্লাহ ৬২ ব্যাচে কোয়ান্টাম
গ্রাজুয়েশন কোর্স করেন। কোর্সের চেতনা তাঁকে
এত উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, তিনি তাঁর স্ত্রী, মেয়ে এবং
অনেক আত্মীয় স্বজনকে উৎসাহিত করেন এ
কোর্সে আসার জন্যে। তিনি নিয়মিত মেডিটেশন
করতেন এবং কোয়ান্টাম উচ্চতর মেডিটেশন
কোর্সও সম্পন্ন করেন। কোর্সের চেতনাকে তিনি
তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনে সহায়ক শক্তি
হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা
ছিলেন। মোহাম্মদপুরে ফাউন্ডেশনের একটি সেল-
এর কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তাবনা তাঁরই দেয়া এবং
তিনি মনোনীত হন প্রথম দায়িত্বশীল হিসেবে।
তিনি সব-সময়ই চাইতেন তাঁর চারপাশের
বঞ্চিতদের সাধ্যমতো সাহায্য করতে।

জনাব আমানউল্লাহ পেশাগত সততার জন্যে
খুব পরিচিত থাকায় তাঁকে অসংখ্য জায়গায় বদলী
হতে হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর সেসব জায়গা থেকে
বহুলোক এসে শোক প্রকাশ করে গেছেন। হৃদয়ের
অন্তঃগতল থেকে দোয়া করেছেন তারা এই সৎ
মানুষটির জন্যে। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার হয়তো
এটুকু ভেবে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, তারা একা
নন, সহযোগিতা এবং শুভকামনা করার জন্যে
জনাব আমানউল্লাহর গুণমুগ্ধ আরও অনেকে
রয়েছেন।

খুবই সংক্ষিপ্ত এক জীবন কাটিয়ে জনাব
আমানউল্লাহ চলে গেছেন আমাদের মাঝ থেকে।
কিন্তু তাঁর আদর্শ হয়তো আমাদের মনে করিয়ে
দেবে যে, নশ্বর এ জীবনটা নির্মোহভাবে কাটিয়ে
যেতে পারাটাই সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

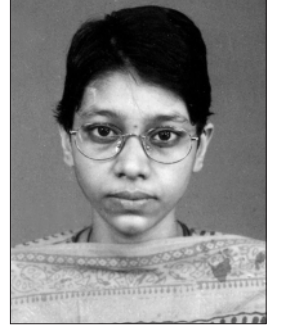
রুমানা আর নেই

রুমানা আর নেই। সবাইকে শোকের সাগরে
ভাসিয়ে ২০০১ সালের ২৯ জানুয়ারী সে চলে গেছে
পৃথিবী ছেড়ে। (ইন্সলিগ্নাহি রাজিউন।)
সবাইকে একদিন যেতে হবে, এটাই অমোঘ
নিয়ম। কিন্তু রুমানার মতো সম্ভাবনাময়ী কোনো
তরুণী যখন মাত্র একুশ বছর বয়সে হারিয়ে যায়
তখন সেই যাওয়াকে বড় অসময়ই মনে হয়।

রুমানা আজ আর নেই, এটি সত্য। কিন্তু
ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেও,
সে যে সংগ্রাম করেছে, অন্যের জন্যে কাজ করার
স্পৃহা দেখিয়েছে, তা আমাদের জন্যে অনুকরণীয়
হয়ে থাকবে।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিল রুমানা। ১৯৯৬
সালে এসএসসি-তে বিজ্ঞান বিভাগে কুমিল্লা বোর্ড
থেকে ৬টি বিষয়ে লেটার সহ স্টার মার্কস নিয়ে সে

পাশ করে।
মাত্র ১৪ নম্বরের
জন্যে মেধা
তালিকায় স্থান
পায় নি সে।
১৯৯৮ সালে
অসুস্থ শরীর
নিয়েও পরীক্ষায়
অংশ নেয় এবং
প্রথম বিভাগে
পাশ করে।



জন্ম থেকেই রুমানা ফুসফুসের সমস্যায়
ভুগছিল। সে কোয়ান্টাম মেডিটেশন কোর্সটি করে
১৯৯৮ সালে ৮০ ব্যাচে। কোর্স করার পর বেশ
কিছুদিন সুস্থ ছিল। নিয়মিত মেডিটেশন করতো।

মাটির ব্যাঙ্কে হক্কুল ইবাদের টাকা জমানোর
ঘোষণা দেয়ার পর, রুমানা নিজে একটি মাটির
ব্যাঙ্ক কিনে নেয়। পয়সা জমাতে শুরু করে।
চট্টগ্রামে প্রথম মাটির ব্যাঙ্কটি জমা দিয়েছিলো
রুমানা। ২০০০ সাল নাগাদ সে সর্বোচ্চ দুটি ব্যাঙ্ক
জমা দেয় এবং দুটিতেই জমানো অর্থের পরিমাণ
ছিল হাজারেরও বেশি টাকা। সে নিজে মারা যাচ্ছে
জেনেও সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করাতে তার আত্মহের
কমতি ছিল না।

শুধু নিজে জমানোই নয়, বন্ধু-বান্ধবদেরকেও
সে উদ্বুদ্ধ করতো মাটির ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে।
মাটির ব্যাঙ্ক ছাড়াও মুষ্টি চাল এবং যাকাত সংগ্রহে
সে সচেষ্ট ছিল। এমনকি মৃত্যুর মাত্র ১৫ দিন
আগে প্রচণ্ড অসুস্থ শরীর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তির
সময়ও সে সংগৃহীত যাকাতের টাকা সাথে করে
নিয়ে এসেছিল। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ
থেকে আমরা যখন তাকে দেখতে যাই, তখন
সবার আগে সেই টাকাটাই তুলে দিয়েছিলো
আমাদের হাতে।

অনেকদিন ধরে তার ফুসফুসে কফ জমে
থাকায় প্রায়ই সে শ্বাসকষ্টে ভুগতো। শীতে বা
ঠাণ্ডায় তা আরও বেড়ে যেতো। ১৪ জানুয়ারী
২০০১-এ হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হলে প্রথমে হালিশহর
জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর
নোয়া হলো হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে। কৃত্রিম
শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন নিতে হচ্ছিল। কিন্তু
অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটলো না। সবশেষে ২৯
জানুয়ারী ২ ঘণ্টা অজ্ঞান অবস্থায় থাকার পর সে
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

খুবই সংক্ষিপ্ত এক জীবন কাটিয়ে রুমানা চলে
গেছে এই জাগতিক গণ্ডি থেকে বহুদূরে। খুব
বিখ্যাত কেউ হয়তো সে নয়। কিন্তু একজন
মৃত্যুপথযাত্রী মানুষও যে কত প্রো-অ্যাকটিভ এবং
আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে পারে, রুমানা
তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা তার আত্মার
মাগফেরাত কামনা করি।

রুমানা আজ আর নেই, সৃষ্টির সেবায় তার
নিবেদিত প্রচেষ্টাকে সম্মান জানানোর জন্যে
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উইশ
বোর্ডটি তার নামে নামকরণ করা হয়েছে।

গ্রহণা : রাবেয়া নাজনীন

জুলাই মাসে ৪৯৮ ব্যাগ রক্ত সরবরাহ কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে গতির সঞ্চার

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ক্রমশ গতিশীল হচ্ছে। বর্তমানে গ্রাজুয়েটদের মধ্যে স্বেচ্ছা রক্তদানে আগ্রহ যেমন বেড়েছে তেমনি ফাউন্ডেশনের সরবরাহকৃত রক্তের বিপুলতার ব্যাপারে ডাক্তার ও গ্রহিতাদের আস্থা বেড়েছে। ফলে প্রতি মাসে এখন গড়ে চারশ' ব্যাগ রক্ত সরবরাহ হচ্ছে। গত জুলাই মাসে সরবরাহ হয়েছে ৪৯৮ ব্যাগ। তবে আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় এ সরবরাহ নিতান্তই অপ্রতুল। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় তিন লক্ষ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন। কিন্তু রক্তদান সম্পর্কে অহেতুক ভীতি ও ভুল ধারণার কারণে অধিকাংশ সাধারণ মানুষই রক্তদানের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। প্রয়োজনীয় শতকরা ৬০ ভাগ রক্তই আসে পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে। যাদের বেশির ভাগই সিকিফিলিস হেপাটাইটিস-বি বা এইডসে আক্রান্ত।

রক্তদানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এবং রক্তের বিপুলতা নিশ্চিত করা, রক্ত সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোয়ান্টাম ল্যাব। স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে মূর্খ রোগীকে সরবরাহ করা হয়। কোয়ান্টাম ল্যাবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ধারিত মৌলিক ৫টি ক্রীনিং (HBSAG/ HCV/ VDRL/HIV/MP) বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করা হয়।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে রক্ত সংগ্রহ করা হয় দুভাবে। কেন্দ্রীয়ভাবে এবং ব্লাড ক্যাম্পিং-এর মাধ্যমে।

ব্লাড ক্যাম্প-এর মাধ্যমে মূলত স্থানীয় সচেতন নাগরিকদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ব্লাড ক্যাম্প সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে আমূল বদলে দিয়েছে। এর আগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যেসব ব্লাড ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হতো, তার গণ্ডি ছিল সীমিত। এগুলো অনুষ্ঠিত হতো বিশেষ বিশেষ সময়ে কয়েকটি সীমাবদ্ধ স্থানে। কিন্তু কোয়ান্টাম যে কোনো স্থানে ব্লাড ক্যাম্প করতে প্রস্তুত।

ইতোমধ্যে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম বিভিন্ন শিক্ষা, বাণিজ্য ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিল্প কারখানা, সরকারী ও বেসরকারী অফিস এবং রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি স্থানে ব্লাড ক্যাম্প-এর আয়োজন করেছে এবং এতে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম বিভিন্ন কলেজ এবং সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্লাড ক্যাম্প-এর আয়োজন করে আসছে। এছাড়া স্কুলগুলোতে শুধুমাত্র শিক্ষকরা রক্তদান করেছেন। এর মধ্যে ধানমন্ডিস্থ মাস্টারমাইন্ড জুনিয়র স্কুল উল্লেখযোগ্য। এতে ছাত্রছাত্রীরাও রক্তদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান : বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেও ব্লাড ক্যাম্প হয়েছে। এর মধ্যে মতিঝিলস্থ ট্রেড কর্পোরেশন, ভ্যানগার্ড সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিমিটেড, মহাখালীস্থ মীর শ্রুতি চিত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মার্কেট এলাকা : ইতোপূর্বে ঢাকা শহরের মার্কেটগুলোতে স্বল্প সংখ্যক ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোয়ান্টাম এটিকে আরও জোরদার করেছে। স্টেডিয়াম ইলেকট্রনিকস মার্কেট, বঙ্গবাজার হকার্স মার্কেট, ইসলামপুর বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মার্কেট, পাটুয়াটুলী ইলেকট্রনিকস মার্কেট প্রভৃতি স্থানে স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান : ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোয়ান্টামের রক্তদান কার্যক্রম বেশ বিস্তৃত লাভ করেছে। যেমন রোটারী ক্লাব, বাংলাদেশ খোখো ফেডারেশন, মেরিনার্স ইয়ং ক্লাব, পাঞ্জেরী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, বাংলাদেশ এক্স ক্যাডেটস অ্যাসোসিয়েশন, মতিঝিল এজিবি কলোনী সমাজ কল্যাণ পরিষদ ইত্যাদি।

বাসস্থান : ব্লাড ক্যাম্প শুধু প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমিত নেই, এটি পৌঁছে গেছে মানুষের ঘরে ঘরে। মীরপুরে

জনাব আবদুল মালেক, গৌরিরয়ার মিসেস তহুরা কালাম, আরামবাগে কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ-এর বাড়িতে প্রতি চার মাস পর পর নিয়মিতভাবে ব্লাড ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া ফ্ল্যাট বাড়িতেও ব্লাড ক্যাম্প করা হয়েছে। ঢাকার হাতিরপুল, ডিওএইচএস, বারিধারা ইত্যাদি জায়গায় ক্যাম্প হয়েছে।

সাংস্কৃতিক সংগঠন : পল্লীমা সংসদ, কল্লক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম রক্ত সংগ্রহ



সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে রক্তদান চলছে হাতিরপুল সেলে।

করেছে।

ফুটপাথ : ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফুটপাথে ব্লাড ক্যাম্প করেছে। স্টেডিয়াম মার্কেটের ঈসা ইলেকট্রনিক্সের ফুটপাথে, পাটুয়াটুলী এম ভট্টাচার্য এন্ড সন্স সংলগ্ন ফুটপাথে ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হয়েছে।

এ ছাড়াও ঈসা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁয়ে ও নারায়ণগঞ্জে নিয়মিতভাবে ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উত্তরার মোল্লারটেক, গাজীপুরের বিআইটিতেও ব্লাড ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হয়েছে।

অন্যান্য : বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, রাজনৈতিক সংগঠন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে কোয়ান্টাম রক্ত সংগ্রহ করেছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রক্তদান কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ধানমন্ডি থানা শাখার উদ্যোগে ফাউন্ডেশন ব্লাড ক্যাম্প পরিচালনা করে।

মোবাইল ডোনার পুল : আজীবন রক্তদাতারা সুস্থতা সাপেক্ষে প্রতি চার মাস পর পর রক্তদানের জন্যে প্রস্তুত। এজন্যে গঠন করা হয়েছে লাইফ ডোনার ক্লাব। কোন মূর্খ রোগীই যেন রক্তের জন্যে এসে খালি হাতে ফিরে না যান, সেজন্যে গঠিত হয়েছে মোবাইল ডোনার পুল। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের স্বল্পতা থাকলে মোবাইল ডোনারদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হয়। তারা ব্যক্তিগতভাবে ল্যাবে এসে রক্ত দান করেন।

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের রক্ত মানবতার সেবায় উৎসর্গীকৃত। এ রক্ত স্বেচ্ছা কর্মীদের সংগৃহীত আপোষহীন মানের মৌলিক ক্রীনিং সম্পন্ন নিরাপদ, সুস্থ ও স্বেচ্ছা রক্ত।

প্রতিবেদক : আলী আহসান

নভেম্বর মাসের ব্লাড ক্যাম্প

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের আওতায় আগামী ২ নভেম্বর, শুক্রবার, মিরপুর শাখায় এবং ৯ নভেম্বর, শুক্রবার, হাতিরপুল সেলের উদ্যোগে সরাদিনব্যাপী ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে।

রক্তদান

কোয়ান্টাম বুলেটিন এখন নিয়মিত প্রকাশিত হবে। গ্রাজুয়েটরা প্রাসঙ্গিক লেখা পাঠাতে পারেন। কাগজের একদিকে স্পষ্ট করে লিখবেন। লেখার সঙ্গে অবশ্যই এক কপি ছবি পাঠাতে হবে।



কোলাহলমুখর ফুটপাথেও চলছে স্বেচ্ছা রক্তদানের কাজ।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : অক্টোবর ২০০১। সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, পরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩২২৯৮৭

গুরুত্ব তত্ত্বাবধানে
সরাসরি শেখার
অনুভূতি সত্যিই অনন্য
ড. মতিউর রহমান

কোয়ান্টাম
মেডিটেশনের
ব্যাপারে
আমার তিনটি
উপলব্ধি ব্যক্ত
না করলেই
নয়। আমরা
যে প্রকল্প
নিয়ে কাজ



করি, আশির দশক পর্যন্ত তা ছিলো
দেশী-বিদেশী কিছু গোষ্ঠীর কাছে খুবই
উপেক্ষিত। কিন্তু অবস্থাটা এখন বদলে
গেছে। এখন আমাদের প্রকল্পের নাম
থাকাটাই যে কোনো অনুদান বা
অনুমোদনের জন্যে অপরিহার্য। তাই
আমি ভাবতাম বড় একটা সেমিনার
করে ঐ বিরোধী গোষ্ঠীর মুখোশ খুলে
দিই এবং তাদের অপকর্ম সর্বসমক্ষে
প্রকাশ করে দিই। কিন্তু এ কোর্স করে
মনে হলো এসবে কী হবে? এতে বরং
আমার লক্ষ্য থেকে আমি দূরে সরে
যাবো এবং জটিলতা আরও বাড়বে।
এখন আমি তাদের উপর জয়ী হওয়ার
লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাবো।

কর্মজীবনে খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ
বলে আমার সুনাম আছে। এমনও
হয়েছে- যে সভায় সভাপতিত্ব করছি
আমি, দুপক্ষ সেখানে মারামারি
করছে। আমি তাদেরকে শান্ত করে
আবার সভা করছি। কিন্তু ভিতরের
ক্ষোভ থেকেই যেতো। রাতের বেলা
ঘুমোতে পারতাম না। এখানে এই
রাগ-ক্ষোভগুলোকে খুব সুন্দরভাবে দূর
করার পদ্ধতি শেখানো হয়েছে। আমি
বিশ্বাস করি রাগ-ক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ
করতে পারলে অনন্য মানুষ হওয়ার
পথে অর্ধেক এগিয়ে যাওয়া যায়।

আমার শেষ উপলব্ধি হলো, গুরুত্ব
তত্ত্বাবধানে সরাসরি শেখার যে পদ্ধতি
প্রাচ্যে প্রচলিত, তা সত্যিই অনন্য।
কারণ পেশা বা গবেষণা উপলক্ষে
পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মননীয় পদ্ধতির
সাথে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছে।
বই পড়ে বা ছবি দেখে তথ্য হয়তো
পাওয়া যায়। কিন্তু কমিউটিমে নেয়া
বা উপলব্ধিতে নেয়া যায় না। ফলে
ব্যক্তির মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তনও
আসে না। কোয়ান্টাম মেডিটেশন
শেখার পর এখন আমি এ কথাটি খুব
স্পষ্ট করেই বলতে পারছি।

[বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্প পরিচালক ড. মতিউর
রহমান ১২৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

কোয়ান্টাম বুলেটিন

জানি এক অনন্য মানুষ
আমরা এক মহান জাতি

নভেম্বর ২০০১

ঢাকার গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে গুরুজী

দৈনন্দিন যে কোনো পরিস্থিতিতে সমস্যা নয় চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করুন

দৈনন্দিন যে কোনো পরিস্থিতিতে
মোকাবিলা করতে হলে পরিস্থিতিতে
সমস্যা হিসেবে না দেখে চ্যালেঞ্জ
হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পরিস্থিতি
বা ঘটনাকে সমস্যা মনে করলে
আপনার উপর পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ
বেড়ে যাবে আর পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জ
হিসেবে গ্রহণ করার সাথে সাথেই
পরিস্থিতির উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ
প্রবাহ বাড়তে শুরু করবে। আর
তখনই প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি
প্রয়োগ করে স্বল্পতম সময়ে
পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা
করতে পারবেন।

গুরুজী শহীদ আল বোখারী
মহাজাতক গত ২৬ অক্টোবর শুক্রবার
ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট
মিলনায়তনে আয়োজিত দিনব্যাপী
গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে এ কথা বলেন।
'দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবিলায়
দৃষ্টিভঙ্গি, অটোসাজেশন ও মনছবি'
শীর্ষক ওয়ার্কশপের এটি ছিলো দ্বিতীয়

পর্ব। ইতঃপূর্বে এ ওয়ার্কশপের প্রথম
পর্ব ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও
রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়।

গুরুজী বলেন, একজন মানুষ
যখন কোনো পরিস্থিতিতে সমস্যা
মনে করে, তখন তার ভিতরে
পরাজিতের মানসিকতা প্রবল হয়ে
নেতিবাচক শক্তির প্রাবল্য সৃষ্টি করে।
আর যখন সে পরিস্থিতিতে বা
ঘটনাক্রমকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ
করে তখন তার ভিতরে বিজয়ীর
মানসিকতা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং
ইতিবাচক শক্তির প্রাবল্য সৃষ্টি হয়।
পরিস্থিতির উপর ক্রমান্বয়ে তার
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়ের জন্যে
পরাজিতের মানসিকতা নয়, বিজয়ীর
মানসিকতাই বেশি ফলপ্রসূ। তিনি
বলেন, প্রতিটি ঘটনা বা পরিস্থিতির
দুটো স্বাভাবিক পরিণতি রয়েছে- হয়
সংকট, না হয় নতুন সম্ভাবনা। সঠিক
দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি ঘটনাকে নতুন
সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করে।



চট্টগ্রামের ওয়ার্কশপে সমবেত ধ্যানমগ্ন মহিলাদের একাংশ

তরুণদের সঠিক দিক নির্দেশনা

ড. দিল আফরোজা বেগম

তরুণদেরকে
আশ্বস্ত করতে
পারি এই বলে
যে, কোয়ান্টাম
মেথড এবং
এর আলোচিত
বিষয়গুলো
যথাযথভাবেই



সাফল্যের চাবিকাঠি। কারণ জীবনে
যারা সফল ও খ্যাতিমান হয়েছেন,
তারা সচেতনভাবে না হলেও
অবচেতনভাবে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ
করে ধাপে ধাপে সাফল্যের পথে
এগিয়েছেন। আমার জীবনেও সে
প্রমাণ পেয়েছি।

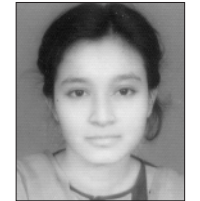
মুগ্ধ হয়েছি কোর্সে অংশগ্রহণ-
কারীদের বৈচিত্র্য দেখে। অবাক
লেগেছে সবাই একই রকম মুগ্ধতা ও
ভালো লাগা নিয়ে ৪০ ঘণ্টার এই
কোর্সে থাকতে পেরেছি বলে। আমি
মনে করি বর্তমান অস্থির শিক্ষাঙ্গনের
বিভ্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের সঠিক দিক-
নির্দেশনা দিতে পারে কোয়ান্টাম।

[বুয়েটে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের
অধ্যাপক ডা. দিল আফরোজা বেগম
১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

হৃদরোগীরা উপকৃত হবেন

ডা. সাদিয়া আফরোজ

আমাদের
চিকিৎসা
বিজ্ঞানের
সাম্প্রতিক
পাঠ্য
বইগুলোতে
'মেডিটেশন'



শব্দটি বারবার ঘুরে ফিরে আসছে।
বিশেষ করে হৃদরোগ চিকিৎসায় এর
কার্যকারিতার ক্ষেত্রে। সে জন্যেই
কোর্সের ব্যাপারে কৌতূহলী হলাম
এবং আমি মনে করি এই ধরনের
কোর্স হৃদরোগীদের জন্যে আসলেই
খুব উপকারী।

কোর্স করে আমার নিজের মধ্যে
এক আশ্চর্য রকম সজীবতা লক্ষ্য
করছি, যা পেশাগত ব্যস্ততা ও
উদ্বেগের কারণে কখনো অনুভব
করতে পারি নি।

[বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের প্রভাষক
ডা. সাদিয়া আফরোজা ১৩৪ ব্যাচের
গ্রাজুয়েট।]

পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আমি এখন শিল্পপতি

সর্দার মুহাম্মদ নূর-উজ-জামান

১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেডিটেশন কোর্সের চতুর্থ দিনটি যেন আমার জীবনের মোড়টাই পাল্টে দিয়েছে। চতুর্থ দিনের প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে উপলব্ধি ব্যক্ত করবার সময় গুরুজী আমাকে একজন ‘শিল্পপতি’ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি আঁতকে উঠলাম। কারণ তখনও আমি শিল্পপতি নই, বরং একটি গ্রুপ অব কোম্পানিতে চাকরি করছি। এমনকি চাকরিটি নিয়ে আমি যে খুব অসন্তুষ্ট, তা-ও নয়। সাথে সাথে প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু তিনি শিল্পপতি হিসেবেই আমাকে সম্বোধন করে গেলেন।

এ ঘটনাটি আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করলো। আমার কানে যেন সারাক্ষণই বাজতে লাগলো, না, আপনি শিল্পপতি। গভীর এক বিশ্বাস, পরিবর্তনের এক দৃঢ় মনস্কি আমার মধ্যে প্রোথিত হলো।

পরবর্তী দশ মাসের মাথায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে পার্টনারশীপে শুরু করলাম একটি বায়িং হাউস। চারজন পার্টনারের মধ্যে আমি হলাম এমডি এবং অত্যন্ত সফল ভাবেই প্রতিষ্ঠিত বিদেশী আমদানীকারকদের সাথে ব্যবসায় চালাতে লাগলাম।

কিন্তু ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি শুরু হলো এক গভীর সংকট। আমেরিকার এক বড় আমদানীকারকের প্রথম দুটি শিপমেন্টের খুব দ্রুত মূল্য পরিশোধ হওয়ায় আমরা খুব আস্থাশীল হয়েছিলাম। ফলে তাদের পরবর্তী শিপমেন্ট আমরা করতে রাজী হই শুধুমাত্র টেলিফোন অনুরোধের উপর ভিত্তি করে। আর এতে করে প্রয়োজনীয় এলসি এবং অন্যান্য ডকুমেন্টগুলোও যথাযথ ছিলো না।

এমন সময়ে শেষ শিপমেন্টটি যেদিন চট্টগ্রাম পোর্ট ছেড়ে গেল, তার পরদিন তাদের কাছ থেকে এক ফ্যাক্স বার্তা এলো। তাতে তারা বললো আমাদের পণ্যের গুণগত মান গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তারা আমাদের মাল খালাস করবে না এবং আমরা যেন আর শিপমেন্ট না করি। চারটি শিপমেন্টের সর্বমোট মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতির এই খবরটি যখন এলো, তখন আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। অথচ আইনগত ভাবেও আমরা কিছু করতে পারবো না, কারণ আমাদের ডকুমেন্ট অপরিপূর্ণ।

ছুটে গেলাম গুরুজীর কাছে। তিনি আশ্বাস দিলেন, ‘আপনি পেমেন্ট পাবেন।’ অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কথাগুলো বিশ্বাস করলাম। এভাবে আড়াই মাস কেটে গেল। তাদের পক্ষ থেকে কোনো যোগাযোগ নেই। আমার চার পাশে সবাই তখন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। অথচ গভীর বিশ্বাস এবং ধৈর্য নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি আর ক্রমাগত যোগাযোগ করে যাচ্ছি। এমনকি ব্যাংক থেকে ফ্যাসিলিটি বন্ধের নোটিশ পাওয়ার পরও আমি যখন বলেছিলাম, ‘পেমেন্ট পাবো, আপনারা যোগাযোগ চালিয়ে যান’, তখন তারা ভাবছিলো আমি বোধ হয় প্রলাপ বকছি।

ইতোমধ্যে জানতে পারলাম, সেই আমদানীকারক ব্যাংকের অনুমোদন



ছাড়াই Freight Forward-এর সঙ্গে যোগসাজশে কিছু মাল খালাস করেছে। আমরা আশাবাদী ছলাম। কারণ যেহেতু আমাদের ডকুমেন্টেও কিছু অসংলগ্নতা ছিলো, তাই মূল্য পরিশোধের জটিলতা দূর করতে বায়ারের এই ভুলগুলো আমাদের জন্যে সহায়ক হবে।

অবশেষে প্রায় ১১ সপ্তাহ পর একদিন সকাল দশটায় ব্যাংকের জরুরী একটি ফোন পেয়ে ছুটে গেলাম এবং শুনলাম আমদানীকারক কোনো রকম মূল্য হ্রাস বা চার্জ ধার্য করা ছাড়াই সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করেছে।

অবিশ্বাস্য এই ফলপ্রাপ্তিতে চোখের পানি সেদিন আঁটকে রাখতে পারি নি। একগ্রন্থ বিশ্বাসই যে সাফল্য সৃষ্টি করতে পারে, এ কথাটিই আরেকবার প্রমাণিত হলো আমার কাছে।

গার্মেন্টস শিল্পে আমার অভিজ্ঞতা ও পরিচিতিতে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্যে ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে ৫ জন পার্টনার মিলে স্থাপন করলাম একটি রফতানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ব্যবসায়ের প্রায় সমস্ত দায়িত্ব সফলভাবেই সম্পন্ন করছিলাম।

কিন্তু এই সফল পরিচালনাই পার্টনারশিপের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। পার্টনারদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও সম্পর্কের অবনতি ঘটলো। এক পর্যায়ে বাকি চারজনই আমার বিপক্ষে অবস্থান নিলেন। ফ্যাক্টরী কার্যত অচল করে দিলেন তারা। সিদ্ধান্ত হলো, হয় নিজেদের মধ্যে কেউ কিনবে অথবা বাইরে বিক্রি করে দেয়া হবে। আমি যদি কিনতে চাই, তাহলে এ মুহূর্তে সব টাকা নগদ দিতে হবে। পাঁচ দিনের আলটিমেটাম দিলেন তারা।

আমার কাছে তখন সব মিলিয়ে যে টাকা আছে তার ১৫ গুণ টাকা আমাকে যোগাড় করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব। অথচ আমার শ্রম ও মেধা দিয়ে তিলতিল করে গড়ে তোলা এই প্রতিষ্ঠানটিই আমার জীবিকার শেষ অবলম্বন।

গুরুজীর সাথে দেখা করে বললাম এ মুহূর্তে ফ্যাক্টরীটি রক্ষা করতে হলে এক অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ আমাকে যোগাড় করতে হবে। কোথেকে যোগাড় হবে জানি না। কিন্তু আমার ফ্যাক্টরী আমি চাই। গুরুজী শুধু বললেন, ‘গভীর বিশ্বাসে চাইতে থাকেন আর সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। সত্যিই তা-ই ঘটলো। পরদিন থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা আসতে লাগলো। অবিশ্বাস্য সব উৎস থেকে টাকা ধার পেতে লাগলাম। আমি যথাসময়ে পার্টনারদের সমস্ত টাকা ও অন্যান্য দায় পরিশোধ করে ফ্যাক্টরী নিজের মতো করে বুঝে নিলাম।

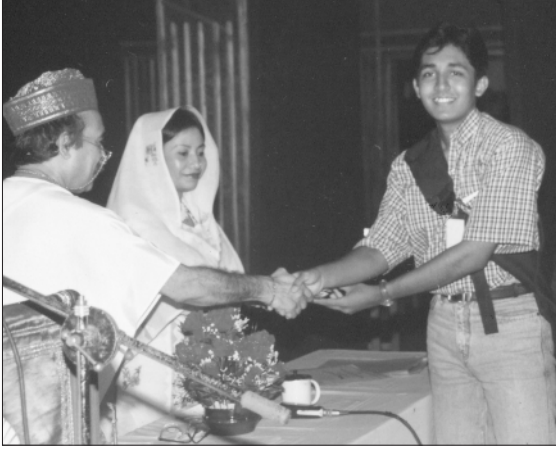
শুধু তা-ই নয়, তার পরপরই খুব বড় অংকের একটি অর্ডার পেয়ে তার এডভান্স থেকেই শতকরা ৯০ ভাগ নগদ দেনা পরিশোধ করলাম, ফ্যাক্টরীকে নতুন করে সাজালাম।

আমি শিল্পপতি হতে চেয়েছিলাম। সেপথে ধীরে ধীরে এগিয়েও যাচ্ছিলাম। কিন্তু আকস্মিক এক ঘটনাচক্রে কিভাবে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের একক মালিক হয়ে গেলাম, তা আমার কাছে এক বড় বিস্ময়। গভীর ধ্যানমগ্নতায় নির্মিত একগ্রন্থ মনস্কি পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে বোধ হয় এমনি করেই অবিশ্বাস্য বাস্তবতা তৈরী করে।

[শিল্পপতি সর্দার মুহাম্মদ নূর-উজ-জামান ২৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ।]



অফিসে স্ত্রী মাসুদা আক্তার আবেদীনের সঙ্গে



গুরুজী ও মা-জীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে খালেদ মাহমুদ।

এইচএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছি

খালেদ মাহমুদ

ব্যাচে আমি কোর্স করেছি। এর আগে কোয়ান্টাম সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু কোর্সটি আমি ভীষণ উপভোগ করেছি এর বাস্তবানুগ টেকনিকগুলোকে।

তবে সবচাইতে ভালো লেগেছে যে বিষয়টি, তাহলো মনছবি। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা এবং একাত্ম বিশ্বাস নিয়ে ক্রমাগত সে পথে এগিয়ে যাওয়া। আর এতে করে লক্ষ্যটি হয়ে ওঠে অবশ্যস্বাভাবী।

কোর্সটি করার সময় আমি ছিলাম এইচএসসি প্রথম বর্ষে। লক্ষ্যের দৃঢ়তার ব্যাপারটি তখন থেকে ভীষণভাবে কাজ করছে আমার ভিতরে।

এমনকি ফাইনাল পরীক্ষার মধ্যে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েও আমি বিচলিত হই নি। মনে হতো, কী আর হবে?

আমার বাবা, মা এবং বড় বোনও এ কোর্স করেছেন। আমি আগেই বলেছি পরিবারের সহযোগিতা একটা বড় ব্যাপার। তাই কোর্সের ইতিবাচক ধ্যান-ধারণায় তারা উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সেটি আমার জন্যে ছিলো একটি প্লাস পয়েন্ট।

আমি বিশ্বাস করি, অর্জনযোগ্য একটি লক্ষ্যকে অন্তরে লালন এবং সে অনুযায়ী নিয়মিত লেখাপড়া একজন শিক্ষার্থীকে তার কাক্ষিত ফল এনে দিতে পারে। আর মেডিটেশন নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

[খালেদ মাহমুদ ১১০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। ২০০১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় ১ম স্থান অধিকারী।]

হার মানবো না

বনানী তানজিমা রহমান

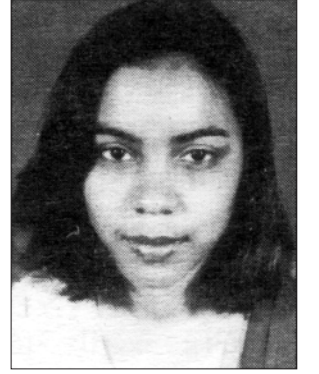
ছেলেবেলা থেকেই আমার পরীক্ষার ফলাফলে প্রচুর উত্থান-পতন দেখা যেতো।

এইবার ভালো তো পরেরবার খারাপ। এর প্রধান কারণ ছিলো এই যে,

কোনো কারণে একটা পরীক্ষা সামান্য খারাপ হলে আমি এতোটাই ভেঙে পড়তাম যে, পরের পরীক্ষাগুলোর প্রস্তুতিতে কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারতাম না। দায়সারাভাবে পরীক্ষা দেয়ায় সেগুলোও খারাপ হয়ে যেতো।

১৯৯৮-এ কোয়ান্টাম কোর্স করার কিছুদিন পরই আমার মাস্টার্স পরীক্ষা শুরু হয়। একটা পরীক্ষা হঠাৎ করেই বেশ খারাপ হয়ে গেল। সামাজিক বিজ্ঞানে একটি পরীক্ষা বেশি খারাপ হলে প্রথম শ্রেণী পাওয়া প্রায় অসম্ভব, কারণ এখানে কোনো বিষয়েই খুব বেশি নম্বর তোলা যায় না। অন্য সময় হলে আমি একেবারেই হতাশ হয়ে পড়তাম। কিন্তু তা না হয়ে মেডিটেশনের মাধ্যমে বিপর্যস্ত মনকে সংহত করে এই প্রথম বারের মতো পরের পরীক্ষাগুলোতে ঠিকভাবে অংশগ্রহণ করলাম। পরবর্তীতে গুরুজীর পরামর্শে ফলাফলের জন্যে মনছবি দেখতে থাকলাম। ফল প্রকাশের পর দেখা গেল আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছি। এর দু'মাসের মধ্যেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকের পদে যোগদান করলাম। এখন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বেশ ভালো আছি। কোনো কিছুই শেষ দেখার আগে পরাজয় স্বীকার করে নেয়া উচিত নয়, এ শিক্ষা আমার সারাজীবন কাজে লাগবে।

[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক বনানী তানজিমা রহমান ৮৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



ছাত্রজীবনে সাফল্যের রহস্য

আলী হায়দার চৌধুরী

নিয়মিত পড়াশোনা ও মেডিটেশন- এ দুটিকে যদি একসাথে চালিয়ে নেয়া যায়, তবেই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা সম্ভব। এর জ্বলন্ত প্রমাণ আমি।

এ বছর অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় আমি সিলেট সরকারী কলেজ থেকে অংশ নিয়ে মানবিক বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৬ তম স্থান

লাভ করেছি।

আমার এ সাফল্যের পিছনে মেডিটেশনের ভূমিকা অনেক।

গত বছর ১১০ তম ব্যাচে মেডিটেশন শিখে মনছবি ও অটোসাজেশনের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করি আমি। তারপর থেকে প্রতিদিন মেডিটেশনে ভালো ফল লাভের জন্যে মনছবি দেখা ও প্রয়োজনীয় অটোসাজেশন দেয়া অব্যাহত রাখি।



সেই সাথে লেখাপড়ার ব্যস্ততার মধ্যেও যৌথ মেডিটেশন ও সিলেটে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টামের সকল অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার সময় করে নিতাম। পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে নেয়ার এ সুযোগ ছিলো আমার জন্যে বাড়তি পাওনা।

এভাবেই খুব ভালো রকম প্রস্তুতি নিয়ে যথাসময়ে পরীক্ষা দিলাম এবং লাভ করলাম কাক্ষিত ফলাফল।

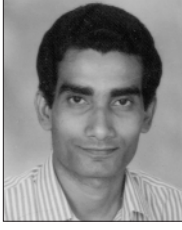
[আলী হায়দার চৌধুরী ছাত্র। সিলেটে অনুষ্ঠিত ১১০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

জটিলতামুক্ত জীবনের জন্যে কালী প্রসন্ন দাস

জীবনকে জটিল করে দেখতে দেখতে এক সময় আমরা জীবনের আনন্দকে হারিয়ে ফেলি। মেডিটেশন জীবনের এই জটিলতা দূর করতে এক অব্যর্থ প্রেসক্রিপশন। বৈষয়িক, নৈতিক এবং আত্মিক- সব ক্ষেত্রেই উন্নতির সুযোগ এতে রয়েছে। কারণ মনকে এখন আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং ইতিবাচক কথা দিয়ে ইতিবাচক বাস্তবতা নির্মাণ করতে পারি। অন্যকে কথা শোনানোর জন্যে এখন আর আমার রেগে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

এখন আমরা আর অন্যের অমঙ্গল চিন্তা করতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি, কোয়ান্টাম চেতনার আলোকে যদি গোটা সমাজ গড়ে ওঠে, সে সমাজে মানুষ অনেক ভালো থাকবে।

[কালী প্রসন্ন দাস সাতার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



সুখানুভূতির সৃষ্টি করেছে

আশরাফ-উজ-জামান

এক সময় আমি যখন সিঙ্গাপুরে ছিলাম একদিন এক জাপানী আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাদের দেশ এত সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কেন তোমরা এত গরীব? তখন এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমি দিতে পারি নি। কিন্তু আজ এতদিন পরে এ কোর্সে এসে এর জবাবটা পেলাম। তা হলো, ‘দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, জীবন বদলে যাবে।’ অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি বদলে জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে কেউ যদি এগোয় তার সৌভাগ্য সুনিশ্চিত। আমিও আমার জীবনের যে মনছবি করেছি, বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তা আমাদের মধ্যে এক সুখানুভূতির সৃষ্টি করেছে।

[ব্যবসায়ী আশরাফ-উজ-জামান ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



আমি আত্মবিশ্বাসী

মো. তাওহীদ হোসেন

যে আমি স্কুলে বা কলেজে সবার পিছনের সারিতে বসে ক্লাস করতাম, সে আমিই আজ মেডিটেশন কোর্স করে সবার সামনে এসে বলছি, আমি আত্মবিশ্বাসী। আমার এ এক বিস্ময়কর পরিবর্তন।

[মো. তাওহীদ হোসেন বিআইটিতে অধ্যয়নরত। ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



আত্মভূবনে বিচরণের পূর্ণতা মওলানা মুহাম্মদ গোলাম রহুল

দীর্ঘদিন বিভিন্ন কামেল পীর ও ব্রহ্মচারীর সান্নিধ্যে কাটানোর ফলে ধ্যান, মোরাকাবা সম্পর্কে ধারণা ছিলো। কিন্তু নিজেকে জানার এই প্রক্রিয়া অনেক আগে শুরু করলেও আত্মভূবনে বিচরণ করার পূর্ণতা কখনো অনুভব করি নি। ‘কোয়ান্টাম মেথড’ আধুনিক মোরাকাবার পদ্ধতি হিসেবে সেই পূর্ণতা এনে দিয়েছে। যার ফলে আমি তৃপ্ত।

[মওলানা মুহাম্মদ গোলাম রহুল কুষ্টিয়ায় বালির দিয়াড় জামে মসজিদের ইমাম। ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



উপলব্ধির অভ্যুদয়

মো. জাহেদুল হাসান

আজ থেকে পাঁচ বছর আগেই মেডিটেশন সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। সে সময় আমি বান্দরবানের ‘রংমা’ নামক স্থানে আনসারের ভারপ্রাপ্ত ব্যাটালিয়ন কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত ছিলাম। পার্বত্য এলাকার সেই অখণ্ড নীরবতার পরিবেশে মেডিটেশন আমাকে আনন্দের অনুভূতি যোগাতো।

আর আজ- পাঁচ বছর পর- কোর্স করে নিজের ভিতরের সৃজনশীল সত্তা আবিষ্কারের উল্লাস অনুভব করছি। যেন উপলব্ধির এক অভ্যুদয় ঘটে গেছে।

[মো. জাহেদুল হাসান আনসার ক্যাডারের একজন কমান্ডিং অফিসার। ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



শিহরণের অনুভূতি

আবদুল্লাহ আল মামুন

চারদিনের এ কোর্সে আমরা যেন আমাদের মনের রাজত্বে বিচরণ করেছি এবং বুঝতে পেরেছি আমরাই এই রাজত্বের রাজা। মেডিটেশনের মাধ্যমে মনকে নিয়ে এতসব জায়গায় ঘুরেছি যা হয়তো বিশ্বভ্রমণ করেও সম্ভব হতো না। বিশেষ করে প্রজ্ঞার মেডিটেশনে বিশ্বজগতের সেই রহস্যময় কল্পপুরীতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। মহাবিশ্বের সেই লাইব্রেরীর অসীম জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যেন মুহূর্তে নানা বিষয়ের জ্ঞান আমার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছিলো। সে এক শিহরণের অনুভূতি।

[আবদুল্লাহ আল মামুন বুয়েটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়নরত। ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



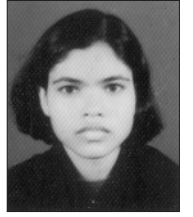
কোয়ান্টা ভঙ্গির সফলতা তাহনিয়া বিনতে রহমান ইলা

কোর্সে আসার আগে যে দ্বিধা-সংশয় ছিল, কোর্স করার পর কোয়ান্টা ভঙ্গি এবং ধর্মির কার্যকারিতা সে সব কিছুকে উড়িয়ে দিয়েছে।

প্রথম অভিজ্ঞতাটি হলো আমার বাবার, তিনিও এই কোর্সে অংশ নিয়েছেন। ঢাকা থেকে কিছুটা দূরে এবং ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সংযোগ হবার ফলে আমাদের ই-মেইলের গতি খুব দীর্ঘ ছিল। এমনকি সিস্টেমের সর্বোচ্চ গতি ১৪০০০ ডিপিএস হওয়ার কথা থাকলেও আমরা সবসময় ২৪০০/৪৮০০ ডিপিএস পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতাম। কাল রাতে আমার বাবা কোয়ান্টা ভঙ্গি এবং ধর্মি ব্যবহার করে মনে মনে ভাবলেন যে তিনি একবারে ইন্টারনেট সংযোগ পাবেন এবং গতি হবে ৭২০০ ডিপিএস। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঠিক তা-ই ঘটলো।

আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হলো, আজ সকালে যখন আমার মা বলছিলেন তাঁর পিঠে এবং ঘাড়ে খুব ব্যথা হচ্ছে, তখন আমি কোয়ান্টা ধর্মি এবং ভঙ্গি করে কয়েকবার বললাম, ‘ব্যথা আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাক।’ কিছুক্ষণ পর আমার মা বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘ব্যথা এখন অনেক কম!’

[তাহনিয়া বিনতে রহমান ইলা কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রী। ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]

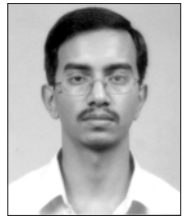


স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

মনজুর রশিদ

আমরা যে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এ উপলব্ধি যথাযথভাবে অনুধাবন করেছি এ কোর্সে এসে। আমি মনে করি, নিজের উন্নতি এবং জাতির উন্নতির জন্যে তরুণ প্রজন্মের অনেক কিছু শেখার আছে এ কোর্সে।

[মনজুর রশিদ বিএ পরীক্ষার্থী। ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



আত্মশুদ্ধির উপায় লাভ করেছি

জাসনিম এনাম

কোয়ান্টাম কোর্স করে আমি আত্মশুদ্ধির উপায় লাভ করেছি। কারণ এ কোর্স নিজের কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দেয়। সফল হওয়ার জন্যে এখন থেকেই আমি চেষ্টা চালাবো।

[জাসনিম এনাম ভিকারুনিসা নুন কলেজের ছাত্রী। ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।]



দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে ঢাকায় গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ

নিজের ভিতরকে ইতিবাচক শক্তির উৎসে পরিণত করতে হবে

নিজের অস্তিত্বের সাথে বিশ্বাস ও আনন্দকে একত্রিত করতে হবে। ভিতরে আনন্দের ফল্গুধারা সৃষ্টি করাই দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবিলার সহজ উপায়। নিজের ভিতরকে ইতিবাচক শক্তির উৎসে পরিণত করতে হবে।

গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক গত ২৬ অক্টোবর ঢাকায় 'দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবিলায় দৃষ্টিভঙ্গি অটোসাজেশন ও মনছবি' শীর্ষক গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় পর্বের আয়োজনে একথা বলেন। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সারাদেশের প্রায় আটশত কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের উৎসবমুখর উপস্থিতিতে দিনব্যাপী এই ওয়ার্কশপের সূচনা করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক মা-জী নাহার আল বোখারী। শুভেচ্ছা বক্তব্যের পরই গুরুজী মূল্যবান আলোচনা শুরু করেন। তিনি ছ'টি বিশেষ মেডিটেশনও পরিচালনা করেন।

ওয়ার্কশপের শুরুতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সাম্প্রতিক বিরাজমান পরিস্থিতির ব্যাপারে কোয়ান্টাম চেতনার দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল প্রকার সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার বিপক্ষে এবং শান্তি ও মানবিকতার সপক্ষে দৃঢ় অবস্থান— কোয়ান্টাম চেতনার এ প্রত্যয়ই ব্যক্ত হলো প্রথম অনুষ্ঠিত শান্তির মেডিটেশনটিতে। পৃথিবীর সকল নির্ধাতিত নিরীহ মানুষের জন্যে সমবেদনা জ্ঞাপন এবং অপরাধী ও শোষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কামনা করে যে প্রার্থনা করা হয়েছে মেডিটেশনটিতে, তাতে যেন পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষদের হৃদয়ের আকুতিই বারে পড়েছে।

ওয়ার্কশপের মূল আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুজী বলেন, প্রতিদিনের রান্না, খাওয়া, কাজ— এসব নিয়ে যে দৈনন্দিন জীবন— তার বেশির ভাগ সময়েই আমরা গতিময়তার অভাব বোধ করি। আমরা প্রাণচঞ্চল উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারি না। অর্থাৎ মানসিক সমস্যাই প্রধান দৈনন্দিন সমস্যা। মানসিক সমস্যা আবার অভ্যন্তরীণ কারণে বা পারিপার্শ্বিক কারণে হতে পারে।

গুরুজী বলেন, হতাশা, দুশ্চিন্তা— এসব হচ্ছে অভ্যন্তরীণ মানসিক সমস্যার রূপ। এর মধ্যে দুশ্চিন্তা মনের সচেতন স্তরের হতাশার প্রকাশ। আর সেই হতাশা যখন মনের অবচেতন স্তরে চলে যায়, তখন তার প্রকাশ ঘটে আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতার মধ্য দিয়ে।

তবে দুশ্চিন্তা, আলস্য বা দীর্ঘসূত্রিতা— এর নীট ফলাফল হচ্ছে কর্মস্পৃহানাশ। আর কর্মস্পৃহানাশ মানেই একজন মানুষের মেধার বিকাশ ব্যাহত হওয়া। অথচ মানুষ যে 'মানুষ' হতে পেরেছে, এটি তার মেধাকে বিকশিত করবার ফলেই। তাই গুরুজী বলেন, এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে আনন্দকে নিজের অস্তিত্বের সাথে একাকার করতে হবে। সে জন্যেই আনন্দের মেডিটেশন— যার মাধ্যমে মুহূর্তে আনন্দের অনুভূতি নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়; আলস্য, ক্লান্তি কেটে গিয়ে আসে উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা।

গুরুজী বলেন, এর পাশাপাশি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে হবে দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে। কারণ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যাকে সংকটে রূপান্তরিত করে। আর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যাকে পরিণত করে নতুন সম্ভাবনায়।

গুরুজী বলেন, পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি হয় বিশেষ করে মূল ঘটনাকে যাচাই না করে ধারণার উপর ভিত্তি করে কথা বলার জন্যে। অথচ তা না করে 'সহজ সত্য' শনাক্ত করলে দেখা যেত শতকরা নব্বই ভাগ মানসিক সমস্যা এমনিতেই চলে গেছে। কারণ, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করা নয়, বরং মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের সেতু নির্মাণই হতে হবে অগ্রগণ্য। আর এ সেতুর ভিত্তি হবে আন্তরিক জয়ের বিশ্বাস।

মানসিক সমস্যার পারিপার্শ্বিক কারণগুলোকে গুরুজী 'আবজর্না' এবং 'পরগাছা' হিসেবে চিহ্নিত করেন। 'আবজর্না' হলো ঈর্ষাকারী, গীবতকারী লোকজন; পরগাছা হলো স্বার্থান্বেষী প্রতারক— যারা ভাষা বা কৌশলের মায়াজাল ছড়িয়ে মানুষকে প্রতারিত করে। গুরুজী বলেন, এদের সাথে মানসিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাহলেই আর তাদের কার্যকলাপ ভিতরের প্রশান্তিকে নষ্ট করতে পারবে না।

গুরুজী বলেন, প্রতারকদের ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে। কারণ তারা ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়েই কাজে নামে। যখনই কেউ বিনা পরিশ্রমে লাভ পাওয়ার কথা বলবে, সাথে সাথে বুঝতে হবে— এ বন্ধুবৈশী শত্রু।

কর্মজীবনেও একইভাবে সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। গুরুজী বলেন, ব্যক্তিগতভাবে বা কর্মজীবনে যে কোনো বাধা বা সমস্যা আসুক না কেন, আমরা যদি সেটাকে সংকট না ভেবে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে পারি, তাহলেই তা হয়ে ওঠে এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর কোনো প্রতিপক্ষই অজেয় নয়, প্রতিটি সমস্যার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে সম্ভাবনার বীজ। শুধু বিশ্বাস করতে হবে যে, আমিই জয়ী হবো, আমি অবশ্যই আনুকূল্য লাভ করতে পারবো। এই প্রত্যয় নিয়ে যদি সংলাপে বসা যায়, তাহলে সংঘাত এড়িয়েই উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব।

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন তাদের উপলব্ধি ব্যক্ত করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যাপক ও টিভি ব্যক্তিত্ব ১০৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। শান্তির মেডিটেশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গুরুজীর গভীর ও বাস্তব সম্মত বর্ণনায় সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর জঘন্য পাশবতার দৃশ্য উপস্থিত গ্রাজুয়েটদের অন্তরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সবাই যেন সমানভাবে আবেগের গভীরে নিমজ্জিত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে গুরুজী যখন অত্যাচারী জালেমের যথোপযুক্ত শাস্তি দাবি এবং বিশ্বে শান্তি কামনা করে পরম করুণাময়ের কাছে আকুল আবেদন জানালেন, মনে পড়লো রবি ঠাকুরের কবিতা—

'নতুন তব জনম লাগি, কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতের বাণী।'

ওয়ার্কশপের শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক দক্ষতা দেখে অভিভূত হয়েছেন দৈনিক ভোরের কাগজের চিফ একাউন্ট্যান্ট ব্যাচের গ্রাজুয়েট রানা প্রতাপ ঘোষ। তার ভাষায়, এতগুলো লোক এক সাথে খাচ্ছে, বিরতিতে বাইরে বেরুচ্ছে, অথচ কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, নেই কোনো হুড়োহুড়ি। সব যেন চলছে ঘড়ির কাঁটা ধরে সুন্দর এক গতিময়তা নিয়ে।

প্রায় একই ভাষায় উপলব্ধি ব্যক্ত করলেন ... ব্যাচের গ্রাজুয়েট প্রিন্সিপাল ডা. মুহম্মদ মাজেদুর রহমান। তিনি বলেন, সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে যে বাস্তব শিক্ষা এ ওয়ার্কশপে পেয়েছি, তা আমার কাছে অভূতপূর্ব।

কয়েকজন শিক্ষার্থী জানালেন তাদের অনুভূতির কথা। প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হলেও বোঝা গেল— আনন্দের মেডিটেশনটি তারা সবাই উপভোগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ'র ছাত্রী ... ব্যাচের গ্রাজুয়েট ফেরদৌসী সুলতানা বলেন, 'আলস্য নামক সর্বনাশা প্রবণতা থেকে মুক্তির উপায় হলো প্রতিটি কাজে আনন্দের সঞ্চার করা। আর একজন শিক্ষার্থী যদি লেখাপড়ার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়, তখন তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন খুব সহজ হয়ে ওঠে। তাই আনন্দের মেডিটেশন আমাদের জন্য এক পরম পাওয়া।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রী ... ব্যাচের গ্রাজুয়েট নাজমুন্নাহার মিলি এবং অর্থনীতির ছাত্রী ১৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট রিজওয়ানা ইসলাম যেন আরও এক ধাপ এগিয়ে। পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে আনন্দের সন্ধান করার যে দীক্ষা পেলাম এই ওয়ার্কশপে, তাকে কাজে লাগিয়ে উজ্জ্বলতম জীবনের দিকে এগিয়ে যাবো— এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

কিছুটা ভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন ... ব্যাচের গ্রাজুয়েট প্রকৌশলী আসমা আক্তার জাহান। ওয়ার্কশপ, সেমিনার শুনলেই তার মনে হতো কিছু ভারী ভারী কথা শুনতে হবে। কার্যত তিনি এসব এড়িয়েই চলতেন। কিন্তু ভাইয়ের গীড়াপীড়িতে তিনি প্রথমবারের মতো কোনো গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে অংশ নেন। তিনি বলেন, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম গুরুজীর কথা। দৈনন্দিন বিষয়ে তিনি যে বক্তব্য দিলেন, তার অনেককিছুই আগে থেকে জানা থাকলেও কথাগুলো যেন প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করলাম। এই ওয়ার্কশপ আমার অসম্ভব ভালো লাগার এক অভিজ্ঞতা।

মধ্যাহ্ন বিরতির পর আলোচনার পূর্বে মাটির ব্যাংক, কার্ড কর্নারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লটারীর ড্র-এর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে গুরুজী বলেন, আমাদের স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রতিদিনই স্বৈচ্ছা রক্তদাতার সংখ্যা বাড়ছে এবং সরবরাহকৃত রক্তের পরিমাণ বাড়ছে। গত জুলাই মাসে ৪৯৮ ব্যাগ রক্ত সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অপর কার্যক্রম 'মাটির ব্যাংক' প্রসঙ্গে দেশের বিভিন্ন এলাকার সংগ্রহ তুলে ধরে বলেন, আমরা আশা করছি মাটির ব্যাংক থেকে এ বছর ৫ লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হবে।

প্রতিবেদক : শিমুল মাহমুদ ও রাবেয়া নাজনীন

উত্তরা শাখা ও নারায়ণগঞ্জ সেলের ইফতার মাহফিল

গত ২২ নভেম্বর বিকাল ৪টায় মেডিটেশন ও মৌনতা পালনের মধ্য দিয়ে উত্তরা শাখার ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া আগামী ৭ ডিসেম্বর শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ সেল ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছে। শাখা কার্যালয়ে অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল ৩.৩০ মিনিটে।

শাখা-সেলের মাসিক আলোচনা

‘রমজানে খতমে কোরআন চিল্লার গুরুত্ব’- নভেম্বরের মাসিক আলোচনার এ বিষয়টি ইতোমধ্যে মিরপুর ও সবুজবাগ শাখা এবং মোহাম্মদপুর, হাতিরপুল ও নারায়ণগঞ্জ সেলে আলোচিত হয়েছে। হাতিরপুল সেলে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাঠচক্রের পরিচালক মওলানা ছায়ীদুল হক এবং মিরপুর শাখা ও নারায়ণগঞ্জ সেলে জনাব লোকমান হোসেন। একই বিষয়ের উপর আলোচনা মতিঝিল, মগবাজার, মহাখালী ও লালবাগ শাখায় এবং কল্যাণপুর সেলে অনুষ্ঠিত হয়।

ব্লাড ক্যাম্প

গেঞ্জারিয়া শাখা আগামী ২৮ ডিসেম্বর ১৯ দীননাথ সেন রোডস্থ শাখা কার্যালয়ে ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করেছে।

নারায়ণগঞ্জ সেল-এর উদ্যোগে গত ২০ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ চাষাড়া রাইফেলস ক্লাবে দিনব্যাপী ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে রক্ত সংগৃহীত হয়েছে ১০৭ ব্যাগ।

মিরপুর শাখা ৪র্থ ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করে গত ২ নভেম্বর শাখা কার্যালয় প্রাঙ্গণে। এ ক্যাম্পে রক্ত সংগৃহীত হয়েছে ৫৬ ব্যাগ।

হাতিরপুল সেল গত ৯ নভেম্বর সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করে। দিনব্যাপী এ ক্যাম্পে রক্ত সংগৃহীত হয় ৮৫ ব্যাগ।

মগবাজার শাখার উদ্যোগে গত ১৪ ও ১৫ নভেম্বর মহানগর ফুলবাড়ীয়া মার্কেটে এবং গুলিস্তান হকার্স মার্কেটে ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। রক্ত সংগ্রহের পরিমাণ যথাক্রমে ৭১ ব্যাগ ও ২১ ব্যাগ।

বাকলিয়া সেলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ওয়ার্কশপে আলোচনা করছেন কোয়ান্টাম মাস্টার জনাব শাফী আল হুদা।



ফাউন্ডেশন সংবাদ



নারায়ণগঞ্জ সেলের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে চারা রোপণ করছেন সেলের কয়েকজন গ্রাজুয়েট।

নারায়ণগঞ্জ সেলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

‘গাছ লাগান, গাছের পরিচর্যা করুন, পরিবেশকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করুন’ এ স্লোগান নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সেলের উদ্যোগে গত ২২ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচিতে হাজীগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আইলপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হাজীগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি নিকেতন প্রাঙ্গণসহ বাসস্থানের আঙিনায় বিভিন্ন জাতের ১৫০টি চারাগাছ রোপণ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ সেলের ঠিকানা পরিবর্তন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নারায়ণগঞ্জ সেলের ঠিকানা পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত বর্তমান ঠিকানা হচ্ছে : জেনুইন টিউটোরিয়াল, ১৫৮ প্যানোরমা প্লাজা (৭ম তলা), চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ। গ্রাজুয়েট ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের এখন থেকে এ ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

চট্টগ্রামে বিশেষ হিলিং কার্যক্রম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রে গত ২৪ অক্টোবর বুধবার থেকে বিশেষ হিলিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখন থেকে প্রতি বুধবার নিয়মিতভাবে কেন্দ্রের অফিসে কোয়ান্টাম মাস্টাররা অসুস্থ ও সমস্যাগ্রস্তদের জন্যে হিলিং মেডিটেশন ও প্রার্থনা করবেন। আগ্রহী যে কেউ এতে নাম তালিকাভুক্ত করতে পারেন।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রে খতমে কোরআন চিল্লা

গত ১৭ থেকে ২৩ নভেম্বর সাত দিনব্যাপী খতমে কোরআন চিল্লা অনুষ্ঠিত হয় ফাউন্ডেশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্রে। ত্রিশ জনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ চিল্লার শেষ দিনে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন শতাধিক সদস্য। কোয়ান্টাম মাস্টার জনাব লোকমান হোসেন প্রশ্নোত্তর প্রদান

ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। চট্টগ্রাম হকুল ইবাদ সেলের পরিচালক জনাব মো. মুজিবুর রহমান ও সমন্বয়কারী জনাব এস এম সাজ্জাদ হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

বাকলিয়া সেল-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ওয়ার্কশপ

গত ৯ নভেম্বর বাকলিয়া সেল (চট্টগ্রাম)-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় মেরন সান স্কুল এন্ড কলেজে। ওয়ার্কশপে ‘কেন মেডিটেশন’, ‘যাকাতের গুরুত্ব এবং সফলতায় পারস্পরিক যোগাযোগের গুরুত্ব’ শিরোনামে তিনটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট কয়েকজন বক্তা। এতে অভিজ্ঞতা বর্ণনা ছাড়াও ছিলো শুভেচ্ছা বক্তব্য পর্ব। সেলের উপদেষ্টা জনাব মো. হানাতুল্লাহর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন আব্দুল্লাহ আল মুনীর।

প্রতিবেদক : রোকেয়া হক

কেন্দ্রীয় কার্যক্রম

কোয়ান্টাম চিল্লা বা মৌন সাধনা : আত্মোপলব্ধি ও ধ্যানের গভীরতা বৃদ্ধির জন্যে শান্তিনগরস্থ কেন্দ্রীয় সেমিনার কক্ষে প্রতি শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০ থেকে ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত চিল্লা বা মৌন সাধনা অনুষ্ঠিত হয়।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম : আত্মিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্যে শারীরিক সুস্থতাও অপরিহার্য। একারণেই কেন্দ্রীয় দফতরে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের আয়োজন করা হয়েছে। সময় : প্রতি রবি ও বুধবার বিকেল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০ মিনিট। কোর্স ফি : গ্রাজুয়েট ৫০০ টাকা ও নন গ্রাজুয়েট ১০০০ টাকা। পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে।

যৌথ মেডিটেশন : একক মেডিটেশনের চেয়ে যৌথভাবে মেডিটেশনে অংশগ্রহণ অনেক বেশি ফলপ্রসূ। তাই ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় সেমিনার কক্ষে আয়োজন করেছে যৌথ মেডিটেশনের। প্রতি সোমবার সকাল ১১.৩০, বিকেল ৫টা ও সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে সাপ্তাহিক যৌথ মেডিটেশন হয়।

গুরুজী ও মা-জীর সাথে সাক্ষাত : শ্রদ্ধেয় গুরুজী প্রতি সোমবার এবং শ্রদ্ধেয়া মা-জী প্রতি রবি ও সোমবার ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত দান করেন।

সাইকি কোর্স ও হিলিং মেডিটেশন : অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা শাণিত করার জন্যে কেন্দ্রীয় ধ্যানঘরে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সাইকি কোর্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩ মাসে সপ্তাহে ১ দিন করে মোট ১২টি ক্লাসে এই কোর্স সম্পন্ন হয়। কোর্স ফি : সাধারণ ১০০০ টাকা, শিক্ষার্থী ৫০০ টাকা। সাইকি কোর্স শেষে অন্যের রোগ নিরাময় ও কল্যাণ কামনায় হিলিং মেডিটেশন অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা-সেলের কার্যক্রম : সারা দেশের বিভিন্ন শাখা-সেলে প্রতি শুক্রবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে যৌথ মেডিটেশন অনুষ্ঠিত হয়। মেডিটেশন শেষে বিভিন্ন আত্ম উন্নয়নমূলক বিষয়ে আলোচনা হয়।

কোয়ান্টাম শিশুকানন স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

গত ৯ নভেম্বর শুক্রবার কোয়ান্টাম শিশুকানন স্কুলের ২০০১ সালের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। বান্দরবানের প্রত্যন্ত এলাকায় স্থাপিত দুঃস্থ ও বঞ্চিত পাহাড়ী এবং বাঙালী শিশুদের এ স্কুলের এটি ছিলো প্রথম পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বান্দরবানের জেলা প্রশাসক জনাব মিয়া মুশতাক আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন লামা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো. আবদুল্লাহ মাসুদ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলী ও স্কুলের সহ-সভাপতি শিল্পপতি সর্দার মুহাম্মদ নূর-উজ-জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশুকানন স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শ্রী তিনকড়ি চক্রবর্তী।

শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্যে কোয়ান্টাম মেডিটেশন সেন্টার লামার কো-অর্ডিনেটর জনাব আনোয়ার আল হক প্রত্যন্ত পাহাড়ী এলাকায় রাস্তাঘাটের অব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও অতিথিদের আগমনে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

স্কুলের আনুষঙ্গিক বিষয় ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন স্কুলের প্রিন্সিপাল জনাব মো. হাফিজুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মিয়া মুশতাক আহমেদ বলেন, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের শিক্ষার আলো বিস্তারের প্রচেষ্টার সাথে একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রত্যন্ত পাহাড়ী এলাকার এই আয়োজনে তিনি সাড়া দিয়েছেন। তিনি শিশুকানন

স্কুলের শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এলাকার দরিদ্র মানুষের কল্যাণে পরিচালিত কোয়ান্টামের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন গোত্রের পাহাড়ী ও বাঙালীদের সমন্বয়ে এরকম চমৎকার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারা নিঃসন্দেহে একটি কৃতিত্বের কাজ। তিনি শিশুকানন স্কুলকে ভবিষ্যতে হাইস্কুলে উন্নীত করা এবং অন্যান্য ব্যাপারে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

সভাপতির বক্তব্যে শ্রী তিনকড়ি চক্রবর্তী বলেন, ‘মমতাপূর্ণ আচরণ ও আন্তরিক সেবার কারণে এলাকাবাসীর কাছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি অনেক উন্নত। আধুনিক সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এই পাহাড়ী মানুষদের দুর্দশা লাঘবের জন্যেই পরিচালিত হচ্ছে আমাদের কার্যক্রম, যার মধ্যে রয়েছে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, চিকিৎসা সেবা, দুঃস্থ পুনর্বাসন এবং শিশুকানন স্কুল স্থাপন।’ এসব কার্যক্রমে এলাকাবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যের পর বিভিন্ন শ্রেণীতে মেধাস্থান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি মিয়া মুশতাক আহমেদ। বিশেষ কৃতিত্বের জন্যেও কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হয়।

সবশেষে ঢাকা থেকে আগত মওলানা ছায়ীদুল হক দোয়া পরিচালনা করেন। পাহাড়ী ও বাঙালী মিলিয়ে প্রায় ছয় শত নারী-পুরুষ এ অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।



শিশুকানন স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বান্দরবানের জেলা প্রশাসক জনাব মিয়া মুশতাক আহমেদের হাতে ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে উপহার তুলে দিচ্ছেন স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শ্রী তিনকড়ি চক্রবর্তী।

লামায় দিনব্যাপী চক্ষু শিবির

গত ১০ নভেম্বর, শনিবার বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সেন্টার লামা এবং লায়স ক্লাব খুলশীর যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী চক্ষু শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ শিবিরে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত পাহাড়ী ও বাঙালী মিলিয়ে কয়েকশত মানুষ অংশ নেয়। তাদের মধ্যে দু’শতাধিক রোগীকে প্রাথমিক চক্ষু পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়।

জটিল এবং অপারেশন প্রয়োজন এমন ৩৭ জনকে বাছাই করা হয় হাসপাতালে চক্ষু পরীক্ষার জন্যে। চক্ষু শিবিরের উদ্যোক্তাদের আহ্বানে তারা চট্টগ্রামে লায়স চক্ষু হাসপাতালে আসেন ১২ নভেম্বর।

চোখে ছানি, নেত্রনালীতে সমস্যার কারণে নিয়মিত পানি পড়া, সাময়িক দৃষ্টিহীনতাসহ চোখের বিভিন্ন জটিলতায় আক্রান্ত পাহাড়ী ও বাঙালীরা ছিলেন রোগীদের মধ্যে। এদের মধ্যে ১৪ জনকে বহির্বিভাগে চিকিৎসা ও চশমার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। তিন জনকে আনুষঙ্গিক পরীক্ষার জন্যে অন্যত্র পাঠানো হয়। বাকি ২০ জনকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে অপারেশনের জন্যে। অপারেশন শেষে সুস্থতার পর গত ২০ নভেম্বর তারা সবাই লামায় ফিরে আসেন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রথম বারের মতো আয়োজিত এ চক্ষু

শিবির দুর্গম পাহাড়ী এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। লায়স ক্লাব, খুলশীর সেক্রেটারী জনাব রউফ খালেদও ভবিষ্যতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগে আরও বড় কার্যক্রমে অংশ নেয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদক : মো.সাজ্জাদ হোসেন
ও রাবেয়া নাজনীন

পরবর্তী পরিচিতি সভা কোর্স ও ওয়ার্কশপ

ঢাকায় পরিচিতি সভা : ১ জানুয়ারী ২০০২, মঙ্গলবার, বিকেল ৪টায়।
ঢাকায় ১৩৫ ব্যাচের কোর্স : জানুয়ারী ১০, ১১ ও ১৭, ১৮, ২০০২।
চট্টগ্রামে পরিচিতি সভা : ১৫ জানুয়ারী ২০০২, মঙ্গলবার, বিকেল ৪টায়।
চট্টগ্রামে ১৩৬ ব্যাচের কোর্স : জানুয়ারী ২৪, ২৫, ৩১ ও ফেব্রুয়ারী ১।
সিলেটে পরিচিতি সভা : ২১ জানুয়ারী ২০০২, সোমবার, বিকেল ৪টায়।
সিলেটে ১৩৭ ব্যাচের কোর্স : ফেব্রুয়ারী ৩, ৪, ৫ ও ৬।

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ : খুলনায়, ২৫ ডিসেম্বর ২০০১। বিষয় : দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবিলায় দৃষ্টিভঙ্গি, অটোসাজেশন ও মনছবি- ১ম পর্ব।
একই বিষয়ের ২য় পর্বের ওয়ার্কশপ সিলেটে অনুষ্ঠিত হবে ২০ জানুয়ারী।

কোয়ান্টাম বুলেটিন এখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রাজুয়েটরা প্রাসঙ্গিক লেখা পাঠাতে পারেন। কাগজের একদিকে স্পষ্ট করে লিখবেন। লেখার সঙ্গে অবশ্যই এক কপি ছবি পাঠাতে হবে।



লামার চক্ষু শিবিরে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে পাহাড়ী ও বাঙালী রোগীরা।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : নভেম্বর ২০০১। সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমেদ ॥ নাহার আল বোখারী, পরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭